WWW.BDBANGLA.COM

প্রিয় সহচর

ইমদাদুল হক মিলন

খোকন এল দুটো বাজার পাঁচ মিনিট আগে।

লালুবাবু জয়িতা আর ওয়াদুদ খান তখন দোতলার রেস্টুরেন্টে। চারজন মানুষের রাউন্ডসেফ টেবিলের একপাশে লালুবাবু জয়িতা আর পাশে ওয়াদুদ খান। খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। তারপর কফির অর্ডার দেয়া হয়েছিল। এইমাত্র কফি এসেছে। লালুবাবু এবং ওয়াদুদ খান দুজনেই কফিতে চুমুক দিয়েছেন। জয়িতা চা কফি একটু ঠাণ্ডা করে খায়। সে তখনও তার মগে চুমুক দেয়নি।

খোকনকে দেখে ওয়াদুদ খান বললেন, তুমি এত দেরি করলা ক্যান?

খোকন সব সময়ই এক ধরনের উচ্ছ্বলতার মধ্যে থাকে। আনন্দ যেন সারাক্ষণই ঘিরে রাখে তাকে। এখনও রেখেছে। ওয়াদুদ খানের কথায় সামান্য বিরক্তির রেশ আছে। খোকন সেটা পাত্তাই দিল না। বলল, ঢাকা শহরে আইজ-কাইল টাইম মেইনটেইন করা যায় না। জামে পড়ছিলাম। এর লেইগা পঁচিশ মিনিট লেট।

যেন জ্যামে পড়ে লেট করে আসাটাও একটা আনন্দের ব্যাপার!

লালুবাবু বললেন, দাঁড়াইয়া রইলা ক্যা খোকন? বস।

ওয়াদুদ খানের পাশের চেয়ারে বসল খোকন।

কফিতে চুমুক দিয়ে ওয়াদুদ খান বললেন, আমরা যে এইখানে বইসা আছি, জানলা কেমনে?

খোকন হাসল। হোটেলে ঢুইকা পয়লা গেছি দাদার রুমে। গিয়া দেখি রুম লক করা। ভাবলাম তয় আপনেরা তিনজন দিদির রুমে বইসা আড্ডা মারতাছেন। গেছি দিদির রুমে। গিয়া দেখি ওই রুমও লক করা। তখন বোজলাম আপনেরা খাইতে গেছেন। এই হোটেলে দুইটা রেস্টুরেন্ট। একটা দোতলায় আরেকটা এগারো তলায়। পয়লা দোতালায়ই আইলাম।

এই প্রথম কফিতে চুমুক দিল জয়িতা। খোকন খেয়াল করল চুমুকটা বেশ সাবধানে দিয়েছে সে। নিশ্চয় ঠোঁটপুড়ে যাওয়ার ভয়। কিছু একটা বলতে চাইল খোকন, তার আগেই জয়িতা তাকাল তার দিকে। কাল না তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকলে, আর আজ দেখছি দিদি দিদি করছ? তোমার কী হয়েছে গো?

খোকন হাসল। কিচ্ছু হয় নাই। লালুদা আর তুমি হইলা নানা নাতীন। নানারে দাদা ডাকলে নাতীনরে দিদি ডাকন যায়। রিস্তা ঠিক থাকে।

বুঝলুম।

কী বুজলা?

তুমি খুবই আনন্দে আছ।

আনন্দে আমি সব সমায়ই থাকি।

কিন্তু তোমার তো এখনও খাওয়া হয়নি। খিদে পেটে এত আনন্দে থাকছ কী করে গো? আগে খেয়ে নাও

তারপর আনন্দ কর।

জয়িতার কথায় মুগ্ধ হল খোকন। আমার যে খাওয়া হয় নাই তুমি সেইটা বুজলা কেমনে?

ওমা, বুঝবো না! তোমার মুখ দেখে বিলক্ষণ বোঝা যাচ্ছে। মুখটা শুকয়ে আমসি হয়ে গেচে। যতই হৈ হৈ করে কথা বলছ না কেন তোমার যে বেজায় খিদে পেয়েচে এ অন্ধেও দেখতে পাবে।

না, অন্ধে দেখতে পাইব না। তোমার পাশে বসা চক্ষুঅলা দুইজন মানুষই তো দেখতে পায় নাই। আসল কথাটা অন্য।

কী সেটা?

মাইয়া মানুষরে মানুষে কয় মায়ের জাত। ক্যান কয় জান?

কেন বল তো? মেয়েরা সন্তান জন্ম দেয় বলে?

সেইটা তো আছেই। আরও অনেক কারণ আছে। মা ছাড়া সন্তানের দুঃখ কষ্ট কেউ বোজে না।

লালুবাবু বললেন, তয় কি জয়িতারে তুমি মা ডাকবানি?

ওয়াদুদ খান এবং জয়িতা শব্দ করে হেসে উঠল। খোকনও হাসল। না সেইটা ডাকুম না। জয়িতা হইল আমার বইন। দেখলেন না অরে আমি দিদি ডাকতাছি। তয় মায় যেমুন সন্তানের মুখ দেইখা তার কষ্ট বোজে, বইনেও তেমুন বোজে ভাইয়ের কষ্ট। আমার খিদার কষ্টটা আমার বইনে বোজছে।

ওয়াদুদ খান বললেন, অহন লেকচার থুইয়া কী খাইবা সেইটা কও। অর্ডার দেই।

আপনেরা যা খাইছেন তাই খামু।

আমরা খাইছি সাদাভাত পাবদা মাছ ভেজিটেবিল আর ডাইল।

তয় সেইটার অর্ডারই দেন।

তুমি চাইলে বিরানিও খাইতে পার।

না ভাতই খামু।

ওয়েটার ডেকে খাবারের অর্ডার দিলেন ওয়াদুদ খান। পাবদা মাছ পাওয়া গেল না। শেষ হয়ে গেছে। এখন আছে শুধু রুই, পাঙ্গাস আর কই। শুনে খোকন বলল, তয় কই মাছই খাই।

ওয়েটার চলে যাওয়ার পর লালুবাবুর দিকে তাকাল খোকন। খবর কী দাদা?

কফিতে চুমুক দিয়ে লালুবাবু বললেন, আর বইল না। ভাল একটা ছ্যাকা খাইছি।

জয়িতা বলল, বুড়োর উচিত শাস্তি হয়েছে। একা একা বেরিয়েছিল ঢাকা শহর দেখতে...

জয়িতার কথা শেষ হওয়ার আগেই খোকন বলল, তারপর ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়ছিল।

জয়িতা অবাক হল। সে কি! তুমি ওসব জানলে কি করে?

ওদুদদা ফোনে বলছে।

কখন বলল?

এই তো কিছুক্ষণ আগে।

লালুবাবুর দিকে তাকাল খোকন। তয় আমরাও দাদা বাংলাদেশের পোলা। ছিনতাইকারী-মিনতাইকারী আমরা পাত্তা দেই না। অরা উল্টা আমগো পাত্তা দেয়।

কও কি!

হ। ওদুদদার মুখে কথাটা শুইনা মেজাজ বহুত খারাপ হইছে আমার। আমি সেগুনবাগিচা গেছিলাম। ওই ছিনতাইকারীগো বিচড়াইয়া বাইর করনের লেইগা।

জয়িতা চোখ বড় করে বলল, কি বলছ খোকনদা?

হ। ঠিকই কইতাছি। সেগুনবাগিচায় গিয়া ওই ছিনতাইকারীগো আমি ঠিকই বাইর করছি। ঠিকই ধরছি অগো।

খোকনের কথা শুনে লালুবাবু এবং জয়িতা এত অবাক হল, কথা তো বলতেই পারল না, কফিতে চুমুক দিতে পর্যন্ত ভুলে গেল। শুধু ওয়াদুদ খান মিটিমিটি হাসছেন আর মাথা নিচু করে কফিতে চুমুক দিচ্ছেন।

খোকন বলল, খালি ধরিই নাই, দাদার ঘড়ি-টেকা বেবাক আদায় করছি।

অবাক বিস্ময়ে খোকনের মুখের দিকে তাকিয়ে লালুবাবু কোনও রকমে বললেন, কি কইতাছ খোকন? এইটা কি সম্ভব?

সম্ভব। বাংলাদেশে সবই সম্ভব দাদা।

চুরি কিংবা ছিনতাই যাওয়া জিনিস আর নগদ টেকা যে ফিরত পাওয়া যায় এইটা তো আমি কোনওদিন শুনি নাই।

জয়িতা বলল, এ তো আমাদের বলিউডের ফিল্মকেও হার মানাচ্ছে! ফিল্মেও এমন হয় না।

ওয়াদুদ খান হাসিমুখে বললেন, বাস্তব অনেক সময় সিনেমারে হার মানায়, বুজলা। খোকন, দেও, দাদার টেকাডা দেও।

খোকন তার মানিব্যাগ থেকে পাঁচশ’ টাকার দুটো নোট বের করে লালুবাবুর হাতে দিল। দেখেন তো দাদা, এই দুইডা নোট কিনা!

টাকাটা হাতে ধরে হতভম্ব গলায় লালুবাবু বললেন, নোট দুইখান তো আমি আর মুখস্থ কইরা রাখি নাই। এই দুইটাই হইব।

তারপর পকেট থেকে একটা ঘড়ির বক্স বের করল খোকন। বক্স খুলে ঝকমকে নতুন একটা ঘড়ি বের করল। আর এই যে আপনের ঘড়ি।

ঘড়ি দেখে লালুবাবু এবং জয়িতা দুজনেই অবাক হল। লালুবাবু কথা বলার আগেই জয়িতা বলল, আরে না না, এটা দাদুর ঘড়ি নয়। এটা নতুন ঘড়ি। দাদুর ঘড়িটা বেজায় পুরনো।

খোকন হাসল। সেইটা ছিনতাইকারীরা আমারে বলছে।

লালুবাবু কোনও রকমে বললেন, মানে?

মানি হইল আমি গিয়া অগো ধরনের আগেই আপনের ঘড়িটা অরা বেইচা ফালাইছে। আমার ডরে আপনের ঘড়ি বেচা টেকার লগে আরও টেকা ভইরা বাইতুল মোকারমের মার্কেট থিকা এই ঘড়ি কিন্না দিছে। আসলে আমি টেরাফিক জামে পড়ি নাই, এইসব কাম সারতে গিয়াই দেরিটা আমার হইছে। যেই পোলাপানগুলি এই কামডা করছে অরা আপনের কাছে আসতে চাইছিল দাদা।

কী জন্য?

মাপ চাইতে। আমি আনি নাই। কী দরকার কন। সব যখন মিটা গেছে আর কি লাভ ওইসব কইরা।

হ। হ। সেইটা ঠিকই আছে।

জয়িতা লালুবাবুর দিকে তাকাল। তবে আর কি গো বুড়ো, পুরন ধেধধেরে ঘড়ি হারিয়ে তোমার তো দেখছি

লাভই হল। নতুন একখানা ঘড়ি পেলে। লাভের লাভ তো দেখি ষোল আনাই হল। এখন আর দেরি করছ কেন? পরে ফেল, নতুন ঘড়ি পরে ফেল।

ঘড়িটা বাঁহাতে পরতে পরতে লালুবাবু বললেন, আমি অবাক হইতাছি অন্য একখান কারণে।

ওয়াদুদ খান শেষ চুমুক দিলেন কফিতে। কী কারণে কন তো?

তোমরা তো ভাই পুলিশের চেয়েও ক্ষমতাধর। যে কাজ পুলিশ এড়িয়ে গেল সেইটা তোমরা কইরা ফালাইলা।

ওয়াদুদ খান কথা বললেন না, হাসলেন।

জয়িতা বলল, ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ যে আমাকে এবার বাংলাদেশে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল। নয়তো এরকম অভিজ্ঞতা সারাজীবনেও হতো না। কালনায় ফিরে গিয়ে এসব গল্প যখন করব, বন্ধুরা বেজায় অবাক হবে। বিশ্বাসই করবে না যে সত্যি সত্যি এমন ঘটনা ঘটতে পারে।

লালুবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, আমার মনে হয় আরও অনেক ঘটনা এবার ঘটবে। সারাজীবন মনে রাখার মতো অনেক ঘটনা।

ওয়েটার এসময় খোকনের খাবার নিয়ে এল টেবিলে। খোকনের সামনে যখন খাবার নামিয়ে রাখছে, জয়িতা তখন তার কফির মগে শেষ চুমুক দিল।

গোলাপ শাহ মাজারের পাশ দিয়ে মাইক্রোবাস চলছে।

মাইক্রোবাসে লালুবাবু জয়িতা আর খোকন। এখন বেলা প্রায় তিনটা। মিনিট পাঁচ-সাতেক আগে হোটেল থেকে বেরিয়ে ওয়াদুদ খান তার গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন এয়ারপোর্টে। নীপেশ তালুকদার আর তার স্ত্রীকে রিসিভ করবেন। লালুবাবু জয়িতা খোকন চড়ল মাইক্রোবাসে। দুটো গাড়ি দু'রাস্তায় চলে গেল।

খোকন বসেছে ড্রাইভারের পাশের সিটে। পেছনের সিটে লালুবাবু বসে আছেন এমন ভঙ্গিতে, যেন তিনি বসে নেই, তিনি আসলে শুয়ে আছেন। তার পাশে জয়িতা যেন একটা জড়সড় হয়ে আছেন। তবু ভারি স্নিগ্ধ সুন্দর লাগছে মেয়েটিকে।

জয়িতা পরেছে হালকা আকাশি রঙের জর্জেট। কালোর ওপর সুন্দর কাজ করা একটা শাল লম্বা করে ফেলে রেখেছে এক কাধে। বাংলাদেশের এই বয়সি মেয়েরা সাধারণত সালোয়ার কামিজ পরে, কিন্তু জয়িতা পরেছে শাড়ি। কালনাতেও খোকন তাকে যতবার দেখেছে শাড়ি পরাই দেখেছে। কাল থেকে শাড়ি পরাই দেখছে। মেয়েদের অন্যান্য পোশাকের চে' জয়িতা বোধহয় শাড়িটাই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে স্থিরতা নেই মেয়েটির। এই একদিকে তাকাচ্ছে, এই আরেক দিকে। সম্পূর্ণ অচেনা শহরকে যতদ্রুত সম্ভব দেখে নেয়ার চেষ্টা করছে।

চেষ্টাটা লালুবাবুও করছেন। আধশোয়া অবস্থাতেই চঞ্চল চোখে চারদিক তাকাচ্ছেন। মাইক্রোবাসের জানালা থেকে দেখছেন বহুকালের পুরনো এক শহরের নতুন চেহারা। বেলা তিনটার দিকেও কীরকম গিজগিজ করছে লোক। রিকশা, স্কুটার, বাস, ট্যাক্সি মিলিয়ে এলাহি কাণ্ড। ফুটপাথ দিয়েও হাঁটার জো নেই। দোকানপাটে একাকার। রাস্তার প্রায় মাঝখানে মাজার। এই ভিড়ভাট্টা হৈ চৈয়ের মধ্যেও মাজারভক্ত কিছু মানুষ বিনীত ভঙ্গিতে বসে আছে চারপাশে। টুপি পরা মাথা মাজারের টাইলস বসান দেয়ালে ঠেকিয়ে, দুহাতে মোনাজাত তুলে বসে আছেন এক বৃদ্ধ।

লালুবাবু বললেন, ও খোকন, এইটা কোন জাগা কও তো?

সামনের সিট থেকে মাথা ঘুরিয়ে লালুবাবুর দিকে তাকাল খোকন।

চিনতে পারতাছেন না দাদা?

না রে মিয়াভাই। একদম চিনতে পারতাছি না।

এইটা গুলিস্তান।

লালুবাবু সোজা হয়ে বসলেন। কও কি? এইটা গুলিস্তান! তয় যে বিয়ানবেলা আমি অন্যরকম দেখলাম!

বিয়ানে আপনে আইছিলেন নি?

হ। রিকশাঅলা তো আমারে অন্য একখান গুলিস্তান দেখাইল। আমি গুলিস্তান সিনেমা হলটা দেখতে চাইলাম। একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং দেখাইয়া কইল, ওইটা গুলিস্তান। হলটা বলে এখন আর নাই। যেখান দিয়া রিকশা চলছিল তার তলায় বলে একটা আন্ডারপাস হইছে। সেখানে বলে একটা মার্কেটও আছে।

খোকন তার হৈ হৈ করা গলায় বলল, বুজছি বুজছি। আপনে আইছিলেন গুলিস্তানের সামনের দিকে। আর এইটা হইল গুলিস্তানের পিছন দিক। ওই যে দেখেন ওইটা হইল টেলিফোন অফিস। আর ইকটু পশ্চিমে গেলে নগর ভবন। নগর ভবন হইল পৌরসভা, মিনসিপালটি।

মিউনিসিপালিটি অফিসটা লক্ষ্মীবাজারে আছিল না?

হ। আছিল। ওইখানে এখন একটা কলেজ হইছে। তয় আমগো নগর ভবনটা একখান দেখার মতো বিল্ডিং দাদা। দারুণ সোন্দর।

কিন্তু তুমি যে কইলা এইটা হইল গুলিস্তানের পিছন দিক। তয় এইদিকেই তো ফুলবাড়িয়া স্টেশনটা হওনের কথা।

হ। এই দিকেই তো! আরেকটু গেলেই।

তয় যে রিকশাঅলা কইল ফুলবাড়িয়া স্টেশন বলে কিছু নাই!

মিছা কথা কইছে। ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল আছে। ইকটু সামনে গিয়া হাতের ডাইন দিকে পড়ব।

লালুবাবু নিভে গেলেন। ও বাস টার্মিনাল! তয় তো রিকশাঅলা ঠিকই কইছে।

খোকন আবার মুখ ঘুরিয়ে লালুবাবুর দিকে তাকাল। তয় আপনে কোন ইস্টিশানের কথা কইছেন?

ফুলবাড়িয়ায় একটা রেলস্টেশান আছিল। ঢাকার মেইন রেলস্টেশান।

খোকন হাসল। হ। তাই কন। আরে সেই স্টেশান তো আমগো জন্মের বহুত আগেই উইঠা গেছে। ওই যে, হাতের ডাইন দিকে চান, ওই যে বাসগুলি খাড়াইয়া রইছে, ওইটা হইল ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল।

লালুবাবু চোখ তুলে তাকালেন। হতাশ হলেন। কোথায় তার প্রথম যৌবনের সেই ফুলবাড়িয়া স্টেশান আর কোথায় আজকের এই বাস টার্মিনাল। সেদিনের সেই টিনের শেড দেয়া নির্জন ধরনের রেলস্টেশানের জায়গায় আজ দাঁড়িয়ে আছে দালানকোঠা দোকানপাট। এদিকে রাস্তা ওদিকে রাস্তা আর শুধু মানুষ। শুধু মানুষ। এতো মানুষের ভার শহরটা বইছে কী করে?

লালুবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ইংলিশ রোডের কাছাকাছি এসে আবার জ্যামে আটকাল মাইক্রোবাস।

লালুবাবু আধাশোয়া হয়েছিলেন, সোজা হয়ে বসে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। ও খোকন, এইটা কোন জাগা?

যতবারই প্রশ্ন করছেন লালুবাবু ততোবারই অতি বিনয় ভঙ্গিতে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে খোকন। এখনও তাকাল। এইটা দাদা ইংলিশ রোড। বামদিককার রাস্তাটা সোজা চইলা গেছে ধোলাইখালের দিকে। তয় এখান থিকা কিছুদূর যাওনের পর বামদিকে নোয়াবপুর হইয়া গুলিস্তান আর ডাইনদিকে কোট-কাচারি, কোট-কাচারির পশ্চিমে শাঁখারি পট্টি।

বুঝছি বুঝছি। তারপর জগন্নাথ কলেজ একপাশে, একপাশে ভিক্টোরিয়া পার্ক। তারপর সোজা সদরঘাট।

কিন্তু ভিক্টোরিয়া পার্ক বইলা তো এখন আর কিছু নাই দাদা।

তয়?

ওইটা হইল বাহাদুর শাহ পার্ক।

আইচ্ছা ওই পার্কটার নামও তাইলে বদলাইছে। আর ধোলাইখালটা বলে এখন আর নাইই?

হ। দাদা, নাই। ওইটা এখন বিরাট চওড়া রাস্তা।

আমরা যামু কোনদিকে?

ডাইনদিকে। ডাইনদিকে হইল নয়াবাজার, নয়াবাজারের উল্টাদিকে হইল জিন্দাবাহার। তারপর...

আরমানিটোলা।

খোকন হাসল। আপনের মনে আছে?

আছে রে দাদা, আছে। তয় তাঁতীবাজারডাও এইদিকেই হওনের কথা।

হ। এইদিকেই। এই তো আমগো নাক বরাবর রাস্তার ওইপারে ওই যে গলিটা ঢুইকা গেল, ওই যে দক্ষিণ দিকে, ওইটাই দাদা তাঁতীবাজার।

লালুবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আহা রে, কি বদলান বদলাইছে ঢাকার টাউন। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পর আসা পুরানা দিনের মানুষরা এই শহরটারে চিনতেই পারব না।

এসময় আইল্যান্ডে দাঁড়ানো ট্রাফিক সিগন্যাল দিল, মাইক্রোবাস ডানদিকে ঘুরে গেল।

নয়াবাজারের সামনে এসে বাজারের পুবে-পশ্চিমে লম্বা বিল্ডিংটা দেখাল খোকন। এই যে দাদা এইটা হইল নয়াবাজার।

যা দেখছেন তাই দেখেই অবাক হচ্ছেন লালুবাবু। নয়াবাজার দেখেও হলেন। কও কি, এইটা নয়াবাজার?

হ।

আমি যখন দেখছি তখন কোনও বিল্ডিং আছিল না। খোলা জাগায় দোকানপাট, তরিতরকারি, মাছের বাজার। দুয়েকটা লাকড়ি খড়ির দোকান আছিল।

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন গলায় লালুবাবু বললেন, আইচ্ছা নয়াবাজারের উল্টোদিকে যে একটা খেলার মাঠ আছিল, পোলাপানের খেলার জন্য স্লিপার আছিল দুই তিনটা, দোলনা আছিল, সেই মাঠটা কো?

কন কি এইখানে মাঠ আছিলনি একটা?

হ।

কি জানি আমি কিছু কইতে পারুম না। তয় আরমানিটোলা মাঠটা আছে। ব্রিজের তলে পইড়া গেছে, কিন্তু আছে।

ব্রিজ মানে?

এইখান দিয়া ব্রিজ হইছে। দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতু। এই তো সেই ব্রিজেই উঠতাছি আমরা।

তাই নাকি? তয় বাবুবাজার, বাদামতলী ঘাট, মিটফোর্ড এইসব জাগা?

এইসব জাগার উপরে দিয়াই গেছে ব্রিজ। ওই যে ওই দেখেন আরমানিটোলা মাঠ।

মাইক্রোবাসের জানালা দিয়ে কয়েক পলকের জন্য মাঠটা দেখলেন লালুবাবু। কিন্তু কিছুই চিনতে পারলেন না। এ তো চারদিকে দালান কোঠা হাসিবাজারের মতো একটা জায়গা। মাঠ যেটুকু আছে সেটাকে মাঠ মনে হয় না। ধূসর মাটির রুক্ষ কিছুটা খোলা জায়গা। অথচ এই মাঠ কি বিশাল ছিল একদিন।

টোল দেয়ার জন্য মাইক্রোবাস তখন দাঁড়িয়েছে। খোকন পকেট থেকে একশ' টাকার একটা নোট বের করে ড্রাইভারকে দিল। ধলেশ্বরীর টোলটাও দিয়া দিয়েন।

মাইক্রোবাস যখন ব্রিজের মাঝখানে, লালুবাবু অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়িগঙ্গা দেখছেন। এই কি সেই নদী? নদীর এপারে সদরঘাট ওপারে জিঞ্জিরা, শুভাইড্ডা। কি বিশাল সেই নদী। এখন নদীকে আর নদী মনে হয় না। নদী যেন বড়সড় একটা খাল। আর জল তো নদীর দেখাই যাচ্ছে না। জল দখল করে আছে শয়ে শয়ে লঞ্চ, কারগো, নৌকা, ট্রলার। দু'পাড় থেকে নদীর ওপর এসে পড়েছে দালানকোঠা, নদী ভরাট করে কোথাও কোথাও উঠছে পিলার, নতুন দালানকোঠা হবে।

এই কি বুড়িগঙ্গা?

লালুবাবু জয়িতার দিকে তাকালেন। এই নদীর নাম জানচ?

জয়িতা ভুরু কুঁচকে দাদুর দিকে তাকাল। এই বুড়ো, তোমাকে না বলেছি আমার সঙ্গে বিক্রমপুরের ভাষা বলবে না।

লালুবাবু হাসলেন। পুরা বিক্রমপুরের ভাষা কই নাই। খালি ওই একটা শব্দ। জানিসকে বলেছি জানচ।

হয়েছে। আর বলবে না।

ঠিক আছে আর কমু না।

এই যে বললে।

বললাম তো আর কমু না।

এবার জয়িতাও হাসল। অবিকল বিক্রমপুরের টোনে বলল, আইচ্ছা কও।

লালুবাবু মুগ্ধচোখে নাতনীর দিকে তাকালেন। আরে তুই তো এক্কেরে খাঁটি বিক্রমপুইরা ভাষায় কথা কইতে পারচ। উচ্চারণ আমার থিকাও ভাল।

সামনের সিট থেকে খোকন বলল, হ সেইটাই দেখতাছি। দিদি, আমগ ভাষাটা শিখলা কখন?

আপনেগ মুখে শুনতে শুনতে শিখা ফালাইছি।

লালুবাবু এবং খোকন দুজনেই মজা পেয়ে হাসল। ড্রাইভার লোকটির ঠোঁটেও মৃদু হাসি।

তারপরই নিজের ভাষায় ফিরল জয়িতা। বল দাদু কি বলতে চাইলে।

না, বলতে চাইছিলাম নদীটার কথা। বুড়িগঙ্গা। তগো পশ্চিমবঙ্গে যে গঙ্গা নদী আছে, বুড়িগঙ্গা হইল তার চেয়েও বয়েসি নদী, পুরানা নদী।

বয়েসে বুড়ি হয়ে গেছে বলে 'বুড়িগঙ্গা'?

খোকন বলল, এই নদী জন্মের পর থিকাই বুড়ি। এই নদী কোনওদিন ছুড়ি আছিল না।

লালুবাবু বললেন, কিন্তু এখন সত্যি নদীটা বুড়ি। দেখতাছ না মরণ যন্ত্রণায় ধুকতাছে! এই নদীর মরণদশা ঘনাইছে। এই নদী আর বেশিদিন বাঁচব না। ছোটকালে আমরা যখন ঢাকা আসতাম তখন কি বিরাট এই নদী! বর্ষাকালে কি ঢেউ উঠতো নদীতে! আমি দুয়েকবার গয়না নাওয়ে কইরাও আইছি। গিরস্ত বাড়ির বড় ঘরের মতো বিরাট সেই নাওও বুড়িগঙ্গার ঢেউয়ে কলার মোচার মতন দোলতো। আর আইজ?

ব্রিজ থেকে নেমে মাইক্রোবাস তখন লোকালয়ে ঢুকেছে।

সামনের সিট থেকে মুখ ঘুরিয়ে লালুবাবু এবং জয়িতার দিকে তাকাল খোকন। আমগো দেশের সব নদীরই এই রকম দশা দাদা। প্রায় সব নদীই মইরা গেছে। পদ্মার অবস্থা আপনেরে দেখামুনে। বুড়িগঙ্গা দেখলেন, কিছুক্ষণ বাদে দেখবেন ধলেশ্বরী। সেই নদীর অবস্থা আরও করুণ।

কিন্তু নদীগুলির এই দশা হইছে ক্যান?

হইছে দাদা আপনেগো লেইগা।

মানে?

ইন্ডিয়ার লেইগা আমগো দেশের নদীগুলির এই অবস্থা। ফারাক্কা বাঁধের লেইগা আমগো দেশের বেবাক নদী মইরা গেছে। খরালিকালে পানি থাকে না নদীতে, বর্ষাকালে আবার তোড়ের মতন আসে পানি, তখন হয় বন্যা, তার মানি দুই সময়েই মরণ আমগো। খরালিতে পানির অভাবে মরণ, বর্ষাকালে পানির চাপে মরণ। এইজন্য আমগো দেশের মানুষ ফারাক্কারে কয় 'মরণ ফাঁদ, ফারাক্কা বাঁধ'।

লালুবাবু বললেন, সবই বুজলাম কিন্তু আমারে তোমার ইন্ডিয়ান কওন ঠিক হয় নাই। আমি এই দেশীই। ইন্ডিয়ান হইল জয়িতা।

জয়িতা বলল, তুমি গায়ের জোরে নিজেকে ইন্ডিয়ান না বললে কি হবে, আসলে ইন্ডিয়ানই। আর আমি অবশ্যই ইন্ডিয়ান। এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তা তুই হ, আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু ফারাক্কার কথা শুইনা মনডা খারাপ হইছে আমার। এইটা কেমুন কথা হইল? এক দেশের ন্যায্য পাওনা জল সেই দেশকে দেবে না? সেই দেশের সবনদী মেরে ফেলবে। খরালিতে শুকিয়ে মারবে, বর্ষায় মারবে ভাসিয়ে।

খোকন বলল, বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের মতন। একাত্তোর সালে পাকিস্তানীগ তিনি বলেছিলেন না, 'আমরা তোমাদের ভাতে পারব। আমরা তোমাদের পানিতে মারব।' এখন ভারত আমগো সেই রকম ভাতে পানিতে মারতাছে।

জয়িতা বলল, পানিতে মারাটা বুঝলুম, নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, বন্যা হচ্ছে। কিন্তু ভাতে মারাটা বুঝলুম না। পানির সঙ্গে ভাতের কী সম্বন্ধ?

আরে পানিতে মারণ অর্থই তো ভাতে মারণ। খরালিকালে, চাষবাসের সিজনে পানি না পাইলে গিরস্তে শস্য ফলাইব কেমনে? ধান ফলাইব কেমনে?

এবার বুঝেছি। তবে খোকনদা, আমি তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার করে বলছি, পৃথিবীতে সবকালেই সবদেশ নিজের স্বার্থটা আগে দেখে। ইন্ডিয়াও তাই করছে। নিজের স্বার্থ তাকে দেখতেই হবে। আর প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে বড়মাছ ছোটমাছকে খাবে।

খোকন তার হৈ হৈ করা গলায় বলল, এইটা বল। এইটা হইল আসল কথা। বড়মাছ ছোটমাছরে খাইব। ইন্ডিয়া বড়দেশ, ইন্ডিয়া সবাইরে খাইতাছে। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এই তিনটা হইল তার তিনবেলার খাওয়া।

লালুবাবু চিন্তিত গলায় বললেন, একই দিনে ইন্ডিয়া লইয়া দুইখান বহুত খারাপ কথা শুনলাম। ইন্ডিয়ান ফেনসিডিল আইসা বাংলাদেশের একটা জেনারেশান শেষ কইরা দিতাছে, আরেক দিকে ফারাক্কা বাঁধ শেষ কইরা দিতাছে নদীগুলি, কৃষিব্যবস্থা। এইটা সর্বনাশা কাণ্ড! এই কারণেই বাংলাদেশের মানুষ ভারত বিদ্বেষী।

খোকন বলল, কথাটা ঠিকই কইছেন দাদা। বাংলাদেশের অনেক মানুষই ইন্ডিয়ার নাম শোনতে পারে না। ইন্ডিয়ার নাম শোনলেই চেইত্তা যায়। কিছু কিছু বুড়া মানুষ আছে, ইন্ডিয়ার নাম তারা শোনতেই চায় না।

এইটার অবশ্য অন্য কারণ আছে।

জয়িতা বলল, কি কারণ?

ধর্মের কারণ। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কারণ। ধর্মের বিরোধ এই অবস্থাটা তৈয়ার করছে। আমরা যারা দেশভাগ দেখেছি তারা জানি কি ভয়ংকর চেহারা হইছিল তখনকার হিন্দু-মুসলমানের। রায়টের পর রায়ট হইছে। হিন্দুরা মারতাছে মুসলমানগো, মুসলমানরা মারতাছে হিন্দুগো। দেখা গেল এক বন্ধু হিন্দু আরেক বন্ধু মুসলমান। ধর্মের কারণে আথকা তাগো সম্পর্ক শেষ হইয়া গেল। বন্ধু বন্ধুরে চিনে না। বন্ধু হইয়া গেল বন্ধুর শত্রু। পশ্চিম বাংলায় মুসলমানের সম্পত্তি দখল কইরা নিল হিন্দুরা, পূর্ব বাংলায় হিন্দুর সম্পত্তি জবর দখল করল মুসলমানে। একলগে গলাগলি কইরা চিরকাল আছিল যারা দেশভাগের কারণে তারা আলাদা হইয়া গেল। একে অপরের শত্রু হইয়া গেল। পাকিস্তান ইন্ডিয়া দুইটা দেশ হইল ঠিকই কিন্তু সেই দুই দেশে আর মানুষ রইল না, মানুষগুলি হয় হিন্দু হইয়া গেল আর নাইলে মুসলমান হইয়া গেল। তারা ভুইলা গেল সেই মহান বাণী,

> সবার উপরে মানুষ সত্য
>
> তাহার উপরে নাই।

ওই যে ওই সময়কার মনোভাব ওইটা কিন্তু এখনও রইয়া গেছে কোনও কোনও মানুষের মইধ্যে। বিশেষ করে বুড়া মানুষের মইধ্যে। ওই সময়কার হিন্দুরা শত্রু মনে করে মুসলমানগো, মুসলমানেরা শত্রু মনে করে হিন্দুগো।

খোকন বলল, হত দাদা ইয়াং পোলাপানের মইধ্যে এইসব নাই। তারা ইন্ডিয়ান ফিল্মের জইন্য পাগল। অমিতাভ, শাহরুখ, কাজল, ঐশ্বরিয়ার লেইগা পাগল। লতা-কিশোরের লেইগা পাগল। অলকা ইয়াগনিক, শোনু নিগমের লেইগা পাগল। দেবদাসের লেইগা পাগল। একটা কইরা নতুন ফিল্ম বাইর হয়, আর সেইটার গান বেবাকতের মুখে মুখে। ঢাকা টাউনের বউঝিরা ইন্ডিয়ান চ্যানেলের সিরিয়েলগুলির লেইগা পাগল। বাড়ির কাজের বুয়ারা পর্যন্ত কাম কাইজ ফালাইয়া 'কাসাউটি জিন্দেগী কা' দেখে। ইয়াং পোলাপান হিন্দু-মুসলমান বোজে না, তাগো যা ভাল লাগে তাই করে।

এইসব দিক দিয়া ইন্ডিয়া অবশ্য অনেক আগাইছে। বলিউডের সিনেমা, জি চ্যানেল, সুন্দরী প্রতিযোগিতা এইসব কইরা ইন্ডিয়া সারা পৃথিবী মাতাইয়া দিছে। ইন্ডিয়ান ফিল্ম অস্কারে যাচ্ছে। আমির খানের 'লগান' ছবিটা তো প্রায় অস্কার পায় পায়।

তয় দাদা আপনেগ ইন্ডিয়ান সিনেমায় তিনজন মুসলমান হিরো টপে বইসা আছে। তিন খান। শাহরুখ, সালমান আর আমির।

এইসব আলোচনা ভাল লাগছিল না লালুবাবুর। কথা অন্যদিকে ঘুরালেন তিনি। জয়িতার দিকে তাকিয়ে বললেন, আরমানিটোলা এলাকার কথা শুনবি?

জয়িতা বলল, বল শুনি।

একবার ঢাকায় আইসা গেণ্ডারিয়ার দীননাথ সেন রোডে, আমার মামার বাসায় কয়েকদিন আছিলাম। তখন প্রত্যেক দিন পুরানা টাউন ঘুইরা ঘুইরা দেখতাম। টাউন সার্ভিস নামে একরকমের বাস আছিল। এক আনা দুই আনায় সদরঘাট গুলিস্তান যাওয়া আসা করণ যাইতো। চাইর আনা ছয় আনায় রিকশায় যাওন যাইতো অনেক দূর। আট আনায় ঘোড়ার গাড়ি। দুইটা টেকা পকেটে লইয়া বাইর হইলে সারাদিন ঢাকা টাউনে বেড়াইয়া, দোফরে কোনও হোটেলে আটআনা দশআনার খরচা কইরা খাইয়া দিনটা কাটাইয়া দেওন যাইতো। সদরঘাটের নদীর পারে নৌকার মইধ্যে আছিল পাইস হোটেল। সেইসব হোটেলে সাইনবোর্ড লেখা থাকতো 'হিন্দু হোটেল'। আট দশআনা খরচা কইরা সেই হোটেলে খাইয়া কতদিন একলা একলা ঢাকা টাউনে ঘুরছি আমি। পায়ে হাইটাই বেশী ঘুরছি। সদরঘাট থিকা পাটুয়াটুলি হইয়া, ডাইনদিকে শাঁখারিপট্টি, সোজা ইসলামপুর, ইসলামপুরে লায়ন সিনেমা হল। একপাশে নোয়াববাড়ি, আহসান মঞ্জিল আরেক পাশে জিন্দাবাহার। সোজা গেলে বাবুবাজার। বাবুবাজারের উত্তরে আরমানিটোলার মাঠ। মাঠের দক্ষিণে একটা বিরাট পানির ট্যাংক তৈয়ার হইতেছিল। তার থিকা একটু আগাইয়া পশ্চিমে গেলে 'শাবিস্তান' নামে একটা

সিনেমা হল। আর্মেনিয়ান সাহেবদের একটা গির্জা। আর মাঠটা কি বিশাল! ওই এলাকায় আর্মেনিয়ান সাহেবরা থাকতো বইলাই জায়গাটার নাম আরমানিটোলা। একদিন, সারাদিন এলাকাটায় ঘুরছিলাম আমি। মাঠের পশ্চিম দক্ষিণ কোনায় একতলা একটা দালান আছিল। জিন্দাবাহারের দিকে যেই গলিটা ঢুইকা গেল সেই গল্লির মুখে একটা মিষ্টির দোকান আছিল। কি সোন্দর যে লুচি হালুয়া বানাইতো। একদিন সকালে রঞ্জন মামায় আমারে ওই দোকানে নিয়া হালুয়া লুচি খাওয়াইছিল। আহা! কি যে স্বাদ সেই হালুয়া লুচির! হালুয়া থেকে কাঁচা ঘিয়ের একটা গন্ধ আসছিল। তুই বিশ্বাস কর, আরমানিটোলা নামটা শুইনা সেই ঘিয়ের গন্ধটা এত বচ্ছর পর আমি ঠিক সেই দিনের মতন কইরাই পাইলাম। শইলটা কাঁটা দিয়া উঠল।

জয়িতা হাসল। বুড়ো, তোমার কি খিদে পেয়েছে?

আরে না।

আমার মনে হয় পেয়েছে। এখন ওরকম একটা হালুয়া লুচি তোমার খুব জমে যেত।

নারে পাগলি, সত্যই সেইটা না। হঠাৎ মনে পড়ল আর কি? শোন, তুই কি পুরানা দিনের বাংলাগান শোনচ?

না তেমন শুনি না।

তয় তরে বইলা লাভ নাই।

বল না শুনি কি বলতে চাও তুমি?

তুই উৎপলা সেনের নাম শোনচস?

তা কেন শুনবো না? সন্ধ্যা প্রতীমার সময়কার বিখ্যাত শিল্পী। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় পাগল ছিলেন তাঁর প্রেমে। শেষ জীবনে উৎপলাকে তিনি বিয়েও করেছিলেন।

বাহ। তুই দেখি ভালই খরব রাখচ।

তুমি আমাকে যতটা গবেট মনে করো আমি কিন্তু তা নই দাদু। তোমাদের ওই হিন্দু-মুসলিম আলোচনা, বাংলাদেশীদের ইন্ডিয়া বিদ্বেষী মনোভাব সবই আমি শুনলুম, কোনও কথা বললুম না। তবে ওই নিয়ে আমার কথা আছে।

কথা থাকলে এক্ষুনি কইয়া ফালা।

না, এখন বলব না। বলব পরে। এখন তুমি উৎপলা সেনকে নিয়ে কথা বলেছিলে তাই বল।

লালুবাবু একটু নড়েচড়ে উঠলেন। উৎপলা সেনদের বাড়ি আছিল এই আরমানিটোলায়।

তাই নাকি?

হ। আনন্দময়ী গার্লস স্কুলের ওই দিকটায়। বিরাট বাড়ি। জমিদার বাড়ির মতন। ততোদিনে উৎপলা সেন কইলকাত্তা চইলা গেছেন। আকাশবাণী কলিকাতায় গান গাইয়া বিখ্যাত হইয়া গেছেন। তয় মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতেন। একদিন খুব কাছ থিকা তারে আমি দেখছিলাম।

বলো কি?

হ।

কেমন ছিলেন দেখতে?

সেইটা তরে আর কি কমু? অপূর্ব সুন্দরী। কি সুন্দর ফিগার! কি সুন্দর চোখ! তখনই ববকাট করা চুল। ওই বয়েসে উৎপলা সেনের মতন সুন্দরী আমি আর দেখি নাই।

লালুবাবুর পেটের কাছে একটা খোঁচা দিল জয়িতা। চোখ টিপে মজাদার মুখভঙ্গি করে বলল, কি হে বুড়ো!

তুমি কি উৎপলা সেনের প্রেমে পড়েছিলে নাকি গো? হ্যাঁ? পড়ে থাকলে বল সেই প্রেমকাহিনী? শুনে ধন্য হই।

জয়িতার কথা শুনে লালুবাবু কি রকম লাজুক হলেন আর সামনের সিট থেকে খোকন হো হো করে হেসে উঠল।

আচমকা বুকে একটা ধাক্কা লাগল নীলুর।

আরে, বাসটা গেল কোথায়, পেট্রোল নেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল, সেই ফাঁকে নীলু গেছে টয়লেটে, বেরিয়ে এসে দেখে নেই। ফিলিং স্টেশান ফাঁকা।

এ কি কাণ্ড! তাকে ফেলেই চলে গেছে বাস? কিন্তু নীলুর ব্যাগটা যে বাসে রয়ে গেছে!

নীলু দিশেহারা হল। এখন কি করবে!

ফিলিং স্টেশানের কাউন্টারে দাড়িঅলা একজন লোক বসে আছে, আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। দুজনের মাঝখানে কাচের দেয়াল। দেয়ালের মাঝখানে দশ নম্বরী ফুটবল সাইজের একটা ফুটো। বিক্রমপুর এলাকায় এই সাইজের ফুটোকে বলে 'ভোগলা'। সেই ভোগলা দিয়ে কথা বলছে দুজন।

নীলু এসে তাদের সামনে দাঁড়াল।

তাকে দেখে দুজনেই ভুরু কুঁচকাল। বাইরে দাঁড়ানো লোকটি বলল, কই থিকা আইলেন আপনে?

টয়লেটে গেছিলাম।

কন কি? বাস তো আপনেরে ফালাইয়া গেছে গা।

সেইটাই তো দেখতাছি।

কাউন্টারে বসা লোকটি বলল, এইটা কেমনে হয়। ড্রাইভাররে বইলা নামেন নাই?

বইলাই তো নামছি।

তয় আপনেরে ফালাইয়া যায় কেমনে?

বুঝতে পারতাছি না।

বাইরে দাঁড়ানো লোকটি বলল, এই লাইনের কোনও বাস তো কোনওদিন এই রকম কারবার করে নাই। কোন কোম্পানীর বাস কইতে পারেন?

নীলু কথা বলবার আগেই কাউন্টারে বসা লোকটি বলল, আরে ইলিশ, ইলিশ কোম্পানী।

বুজছি। আলী ভাইগ কোম্পানী। মেদিন মণ্ডলের আলী ভাই।

হ। আমার দোস্ত কাইয়ুমেরও শেয়ার আছে এই কোম্পানীতে।

দাড়িঅলা লোকটি নীলুর দিকে তাকাল। বাসে ব্যাগ সোটকেস কিছু রইয়া গেছেনি আপনের?

নীলু ততক্ষণে খুবই বিরক্ত হয়েছে। বিরক্ত হলে চেহারা বদলে যায় তার। কপালে দু'তিনটা ভাঁজ পড়ে আর মুখটা যায় শক্ত হয়ে। শক্ত মুখ নিয়েই বলল, সুটকেস-ফুটকেস আছিল না, একটা ব্যাগ আছিল।

ব্যাগে আছিল কি?

তেমন কিছু না। দুই একটা জামাকাপড় আর টুকটাক দরকারী জিনিস।

বুজছি, বুজছি। ইলিশ কোম্পানী কামডা ভাল করে নাই। বইলা নামনের পরও ফালাইয়া যায় কেমনে?

বাইরে দাঁড়ানো লোকটা বলল, তয় আমার মনে হয় আপনে একটু বেশি টাইম নিছেন। পেশাব করতে কতক্ষুণ লাগে?

পেশাব না ভাই, অন্যটা।

বুজছি, বুজছি। অন্যটা ধরছিল। টাইম বেশী নিছেন দেইখাই কারবারটা হইয়া গেছে। মনে হয় অন্য পিসিনজাররা চিল্লাচিল্লি করতাছিল, কেউ হয়তো রাগারাগিও করছে এর লেইগা ডিরাইভার চেইত্তা গেছে। তারবাদে আপনেরে ফালাইয়াই চইলা গেছে।

কাউন্টারে বসা লোকটি বলল, আপনে যাইবেন কই?

মাওয়া।

মাওয়ার বাজারে?

নীলু মাথা নাড়ল।

বাড়ি কই আপনেগ?

নীলু আরও বিরক্ত হল। রুক্ষ গলায় বলল, এত কথা কইতে পারুম না ভাই। আমারে খালি একটা বুদ্ধি দেন, এখান থিকা মাওয়া পর্যন্ত আমি যাইতে পারি কেমনে? ব্যাগটা ফিরত পাওয়া সম্ভব কি না!

লোকটি হাসল। আরে ভাই চেতেন ক্যান? যাওনের ব্যবস্থা হইবোনে। এই রাস্তার সব বাসই মাওয়া যায়। কোনও একটায় উইঠা যাইয়েন। মাওয়ার ঘাটে ইলিশ কোম্পানীর কাউন্টার আছে। ওখানে গিয়া খোঁজ নিলে আর আপনের ভাগ্যি যুদি ভাল থাকে তয় ব্যাগটাও পাইয়া যাইবেন।

ততক্ষণে দিশেহারা ভাবটা কেটে গেছে নীলুর, বিরক্তিটা কাটেনি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে নেশাখোড় মানুষদের নেশা করতে ইচ্ছে করে। নীলুর সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ফিলিং স্টেশানে সিগ্রেট খাওয়া যায় না। পেট্রোলের মতো ভয়াবহ জিনিসের কারবার। সিগ্রেট ধরাবার জন্য ম্যাচ কিংবা লাইটার জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

নীলু কি তাহলে সামনের রাস্তাটায় গিয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানতে টানতে বাসের জন্য অপেক্ষা করবে!

তারপরই যেন ফিলিং স্টেশানটা পুরোপুরি চোখে পড়ল তার। বাসটা যখন এখানে ঢুকেছিল তার কয়েক মিনিট আগে থেকেই তলপেটে চাপ পড়েছিল। সকালবেলা পেটটা ক্লিয়ার হয়নি। দুপুরে খেয়েদেয়ে বাসে ওঠার পর থেকেই একটু একটু অস্বস্তি। পেটে গ্যাস হচ্ছিল। দু'তিনবার গোপনে বায়ুও ত্যাগ করল। তারপর একসময় আসল চাপটা পড়ল। জানালার ধারে বসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল নীলু। রাস্তার ধারে কোনও রেস্টুরেন্ট কিংবা কাজটা সারা যায় এমন জাগা দেখলেই ড্রাইভারকে বলবে বাস থামাতে। সেটার আর দরকার হল না। বাস ঢুকে গেল ফিলিং স্টেশানে। সঙ্গে সঙ্গে চান্সটা নিল নীলু। ওরকম চাপের মুখে কে তাকায় কোনদিকে। নীলুও তাকায়নি। কাজ সেরে বেরিয়ে আসার পর তো এই কারবার। এখন ফিলিং স্টেশানটা খেয়াল করে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল নীলু। আরে বা, এ তো দেখি কায়দার ফিলিং স্টেশান। লাইট ফাইট লাগিয়ে বেশ একটা চটকদার অবস্থা। যাত্রীদের সুবিধার জন্য টয়লেট বাথরুমের সুন্দর বন্দোবস্ত। কাজটা নীলু হাই কমোডে বসে সারতে পেরেছে। ফ্লাশও বেশ জোরদার কাজ করল। বদনা ফদনার কারবার নেই, হ্যান্ড শাওয়ারে শৌচকর্মের ব্যবস্থা। হাত মুখ ধোয়ার জন্য সুন্দর বেসিন, বেসিনের ওপর ঝকঝকে মুখ দেখার আয়না। তাকের ওপর লাইফবয়ের লিকুইড সাবান। এ তো গেল ভেতরের ব্যাপার, বাইরেও তো দেখি কায়দার অন্ত নেই। দক্ষিণ দিকে আরামছে বসে হাওয়া খাওয়ার জন্য ছাতার মতো দু'খান শেড তৈরী করে তার তলায় প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল পেতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ কি ওখানে বসার চান্স পায়? তেল নিতে আসা বাসগুলো এখানে ক'মিনিট দাঁড়ায়? সেই ফাঁকে কে নামে বাস থেকে, কে গিয়ে বসে ওই শেডের তলায়?

নীলু মনে মনে বলল, আমি বসব। আমি কিছুক্ষণ বসে থাকব। কিন্তু ওখানে বসলেই তো সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করবে। সঙ্গে এককাপ চা হলে আরও জমে যাবে। এক চুমুক চা, একটান সিগ্রেট। নয়তো গরম গরম এককাপ

চা শেষ করে খুবই আয়েশি ভঙ্গিতে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে উদাস চোখে কোনদিকে তাকিয়ে টানতে থাকা। সামনের রাস্তা দিয়ে সা সা করে বাস, মিনিবাস, ট্রাক, ট্যাক্সি যাবে, হাওয়ায় ভাসবে চিকন ধুলোবালি, ওসব তোমার তাকিয়ে দেখবার দরকার নেই। তুমি থাকবে তোমার মনে। রবীন্দ্রনাথের গানের মতো, আমায় থাকতে দে না আপন মনে।

নীলু শেডের তলায় এসে বসল। বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভুলে গেল সে এখানে কেন এসেছে, কেন বসে আছে। বাস তাকে ফেলে চলে গেছে, বাসে রয়ে গেছে তার ব্যাগ। সে কোথায় যাবে? কেন যাবে কিচ্ছু তার মনে রইল না। মগ্ন হয়ে গান গাইতে লাগল সে।

আমায় থাকতে দে না আপন মনে

সেই চরণের পরশখানি মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥

কথার পাকে কাজের ঘোরে ভুলিয়ে রাখে কে আর মোরে,

তার স্মরণে বরণমালা গাঁথি বসে গোপন কোণে॥

এই যে ব্যথার রতনখানি আমার বুকে দিল আনি

এই নিয়ে আজ দিনের শেষে একা চলি তার উদ্দেশে

নয়নজলে সামনে দাঁড়াই, তারে সাজাই তারি ধনে॥

ড্রাইভার লোকটির নাম বেলাল।

গাড়ি খুবই ভাল চালায় সে, কিন্তু কথা একদম বলেই না। কথায় না, সে আসলে কাজে বিশ্বাসী। তবে অন্যের কথা শুনে মিটি মিটি হাসার একটা স্বভাব আছে। লালুবাবু খোকন আর জয়িতার কথা শুনে ওরকম হাসিটা সে প্রায়ই হাসছিল। একসময় একটা কথা সে বলল। বলল খোকনকে। ভাই, তেল নেওন লাগব।

খোকন মুখ ঘুরিয়ে বেলালের দিকে তাকাল। তেল লাগব?

হ।

আগে দেখি কিছু কইলা না?

আপনে না জিগাইলে কেমতে কই।

আমার জিগান না জিগানের লগে তেলের সমন্ধ কি? গাড়ি চালাও তুমি, তেল আছে না নাই এইডা বুজবা তুমি।

বেলাল চুপ করে রইল।

খোকন বলল, ঠিক আছে, তেল নেও। সামনেই তালুকদার ফিলিং স্টেশান পড়ব। ওইখানে ঢোক।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাইক্রোবাস এসে তালুকদার ফিলিং স্টেশানে ঢুকল।

জয়িতা বলল, ও খোকনদা, এখানে নামা যাবে?

হ। হ। যাইব। নাম।

ওয়াশ রুমটুম আছে?

আরে বেবাক কিছু আছে। এইটা হইল আমগো আউয়াল তালুকদারের পেট্রোল পাম্প। আলহাজ্ব আবদুল আউয়াল তালুকদার। এক নম্বর মেদিনী মণ্ডল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আছিল গত আওয়ামী লীগের আমলে। মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসাবে স্বর্ণপদক পাইছে। খুবই আমুদে ধরনের মানুষ। যে কোনও

কিছুতে চমক দিতে পছন্দ করে। তুমি এখানে নাম, নামলেই চমকটা বুজতে পারবা।

লালুবাবু বললেন, জাগাটার নাম কি?

নিমতলী।

নিমতলীটা কোন জাগায় কও তো?

জয়িতা হাসল। কি বোকার মতো প্রশ্ন। শোন বুড়ো, উত্তরটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি। নিমতলী জায়গাটা হচ্ছে নিমতলীতেই।

লালুবাবুও হাসলেন। আরে ছেমড়ি আমি ওই অর্থে কই নাই। আমি জানতে চাইছি নিমতলীটা বিক্রমপুরের কোন থানায় পড়ছে।

খোকন বলল, দাদার কথাটা আমি বুজছি। দাদা, এইডা হইল সিরাজদিখান থানায়।

এইবার বুজছি। লও নামি।

একে একে সবাই নামল।

জয়িতা বলল, খোকনদা, তোমার কথা শুনে আমি বুজতে পেরেছি এখানকার সবই তোমার চেনা। বহুবার এখানটায় তুমি এসেছ। ওয়াশরুমটা কোনদিকে বল তো?

খোকন আঙুল তুলে দেখাল। ওই তো পিছন দিকটায়।

জয়িতা দ্রুত হেঁটে সেদিকে চলে গেল।

লালুবাবু তখন চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। কি রকম রুক্ষ রুক্ষ লাগছে জায়গাটা। হাইওয়ের পাশটা অবশ্য এরকমই হবে।

রাস্তার ওপাশটা পশ্চিম দিক। সেখানটায় বিক্রমপুরের আদি চেহারা কিছুটা চোখে পড়ে। জলাভূমি, ধানক্ষেত তারপর গ্রাম। গ্রামের মাথার ওপর দুপুর তিনটার রোদেভাসা আকাশ। জানুয়ারি মাসের আকাশ বেশ স্বচ্ছ।

লালুবাবুর কেন যে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

বেলাল তখন খোকনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কয়টা তেল নিমু?

দশটায় হইব না?

হইব।

তয় দশটাই নেও।

মাইক্রোবাস দেখে স্টেশানের একজন কর্মচারী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। খোকনকে দেখেই লম্বা একটা সালাম দিল সে। আসসেলামালাইকুম খোকন ভাই। ভাল আছেন নি?

আছি। তর খবর কি মতি?

চইলা যাইতাছে।

তালুকদার সাব পাম্পে আসে না?

কাউলকা একবার আইছিল।

দে দশটা তেল দে।

তার আগে একটা কথা কন, আপনেরা কি কাজির পাগলা ইসকুলের পোরোগেরামে যাইতাছেন?

হ। প্রোগ্রাম তো কাউলকা।

হেইডা জানি।

মতি মুখ লম্বা করে হাসল। কথাডা ক্যান জিগাইলাম জানেন?

না, ক্যান ক তো?

আপনেগ লেইগা বিশটা তেল ফিরি।

কি?

হ। তালুকদার সাবের অডার। কাজির পাগলা ইসকুলের পোরোগেরামের লেইগা কেওই যুদি তেল নিতে আহে, তারে বিশটা তেল ফিরি দেয়া দিবা।

শুনে খোকন যতটা না তারচে' অনেক বেশী মুগ্ধ হলেন লালুবাবু। শুইনা খুব খুশি হইলাম রে দাদা। আমগো কাজির পাগলা স্কুলের লেইগা এমুন মায়া মাইনষের, ভাবতেই বুকটা গর্বে ফুইল্যা যাইতাছে।

খোকন বলল, তার থিকা বড় কথা কি জানেন দাদা, আউয়াল তালুকদার কাজির পাগলা স্কুলের ছাত্র না। আমরা শতবর্ষপূর্তি করতাছি, সে আছে আমগো লগে। আল্লায় টেকা দিছে যেমুন, মনডাও দিছে। যান আপনে যান দাদা, বাথরুমের কাম সাইরা আসেন।

জয়িতা যেদিকে গেছে সেদিকে যেতে যেতে শেডের দিকে চোখ পড়ল লালুবাবুর। শেডের তলায় উদাস হয়ে বসে আছে এক যুবক। পরনে জিনস, কেডস। বসে থাকার ভঙ্গিতে আশ্চর্য এক বিষণ্ণতা।

ততক্ষণে গাড়িতে তেল ভরতে শুরু করেছে মতি।

জয়িতা আর লালুবাবু প্রায় একই সময়ে ফিরে এল। জয়িতা মুগ্ধ গলায় বলল, খোকনদা, এ তো একেবারে থ্রি স্টার হোটেল গো। আমি বুজতেই পারছিলুম না আমি কি গ্র্যান্ড আজাদ হোটেলের রুমে রয়েছি নাকি অন্য কোথাও।

খোকন হাসল। বুঝলা দিদি, এইটাই হইল আউয়াল তালুকদার।

বুঝলুম। তবে যাই বল খোকনদা, গ্রাম এলাকার গ্যাস স্টেশানের ওয়াশরুম এতটা স্ট্যান্ডারড হবে এ আমি কল্পনাই করিনি। তাও বাংলাদেশের মতো দেশে। এটা যদি ইউরোপ আমেরিকা হতো আমার কথা ছিল না।

লালুবাবু বললেন, বাংলাদেশ সত্যই অনেক আগাইছে। ঢাকা থিকা বিক্রমপুরে আইছে এমুন একখান রাস্তা, বাস-টেক্সি চলে, রাস্তার ধারে এমুন পেট্রোল পাম্প এই হগল আগের দিনের মানুষরা কল্পনাও করে নাই। বিক্রমপুর আছিল নিচা অঞ্চল, পানির দেশ। সেই দেশের চেহারা হইছে কি?

কাউন্টারে বসা দাড়িঅলা লোকটি বেরিয়ে এসেছে। খোকনকে দেখে সেও সালাম দিল।

খোকন বলল, খবর কি বশির? ব্যবসা কেমুন?

খুবওই ভাল দাদা। তালুকদার সাবের কপাল, বুজলেন না! যেই দাম দিয়া পেটটুল পাম কিনল, অহন এইডার দাম তিনগুণ। মাসে ইনকাম সাত আস্টলাক টেকা।

তেল ভরা শেষ করে মতি এগিয়ে এল। চা খাইবেননি দাদা?

না, না, অহন আর চা খামু না। মেলা দেই। লগে গেস্ট আছে।

কোন জাগার গেস্ট।

কইলকাত্তা থিকা আইছে। এই লালুদা হইল আমগো কাজির পাগলা স্কুলের ছাত্র। ছয়চল্লিশ বচ্ছর পর দেশে আসল। বাড়ি আছিল ওয়ারী। আর এই দিদিটা হইল জয়িতা, লালুদার নাতনি।

বশির এবং মতি দুজনে প্রায় একসঙ্গেই সালাম দিল তাদেরকে। লালুবাবু এবং জয়িতা অতি বিনয়ী ভঙ্গিতে হাতজোড় করল। নমস্কার।

বশির বলল, কইলকাত্তার গেস্ট লইয়া চা না খাইয়া আপনে আমার এখান থিকা যাইতে পারবেন না খোকন ভাই। আসেন, ভিতরে আইসা বসেন।

খোকন তারপরও না করার চেষ্টা করল কিন্তু বশির কোনও কথাই শুনল না। ভিতরে এসে বসতেই হল। মিনিটখানেকের মধ্যে চা না তিনটি লম্বা ধরনের সুন্দর গ্লাসভর্তি কোক নিয়ে এল মতি। এর মধ্যেই গ্লাসের গায়ে কুয়াশা জমে গেছে। অর্থাৎ বেশ ঠাণ্ডা কোক।

কোক জয়িতার খুব প্রিয়। বেশ আগ্রহ নিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল সে। মুগ্ধ গলায় বলল, বাহ্ বেশ ঠাণ্ডা। এত তাড়াতাড়ি এত ঠাণ্ডা কোক কোত্থেকে এল?

বশির হাসিমুখে বলল, এইখানে ফ্রিজ আছে। ফ্রিজে কোক, পেপসি, সেভেন-আপ, স্প্রাইট সব আছে। ইসপিসাল গেস্টগো লেইগা এই ব্যবস্থা কইরা রাখছেন তালুকদার সাবে।

লালুবাবু জয়িতার দিকে তাকিয়ে বললেন, এইটাই হইল পূর্ব বাংলা, অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের আতিথিয়তা। একটা ভাত টিপলে যেমন হাড়ির বেবাক ভাতের অবস্থা বোঝা যায়, এই জাগার এই আতিথিয়তা দেইখা তুই পুরা বাংলাদেশের মানুষের অন্তরটা দেখতে পাবি।

মিনিট পাঁচেক পর মাইক্রোবাসের সামনে দাঁড়াল ওরা। দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল। খানিক আগে শেডের তলায় বসে থাকা সেই যুবকটি বসে আছে ড্রাইভারের পাশের সিটে।

খোকন ভুরু কুঁচকে যুবকটির দিকে তাকাল। কী রে ভাই, আপনে কে?

যুবক হাসিমুখে বলল, আমার নাম নীলু।

নীলু তো বুজলাম, আমগো গাড়িতে উইঠা বইসা রইছেন ক্যান?

নীলুর স্বভাব হচ্ছে যে যেরকম ভাষায় কথা বলে সেও সেরকম ভাষায় তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। কয়েকটি ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হয়। যেমন সিলেট নোয়াখালি চিটাগং এই তিনটি এলাকার ভাষা সে তেমন বলতে পারে না। বরিশালেরটা কিছু কিছু পারে। খাস ঢাকাইয়া ভাষাটাও মোটামুটি পারে। ঢাকা বিক্রমপুর মানিকগঞ্জ ফরিদপুর এসব এলাকার যে একটা কমন ভাষা আছে সেটা বেশ ভালই পারে। খানিক আগে ফিলিং স্টেশানের কর্মচারী দুজনের সঙ্গে সেই ভাষায়ই কথা বলেছে। এখনকার এই ভদ্রলোকের ভাষাও ফিলিং স্টেশানের কর্মচারী দুজনের মতোই। অনায়াসেই নীলু তার সঙ্গে ওই ভাষাটা চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোক এবং বেশ মিষ্টি ধরনের একটি যুবতী মেয়ে আছে। মেয়েটির শাড়ি পরার ভঙ্গিটি খুবই সুন্দর। শাড়ি তো সব মেয়েই পরে কিন্তু সবাই সুন্দর করে পরতে পারে না। এই যুবতীটি অতি সুন্দর করে পরেছে। শাড়ি সুন্দর করে পরার কারণে যতটা না সে মিষ্টি তাকে দেখাচ্ছে তারচে’ অনেক বেশী মিষ্টি। অনেক বেশি বাঙালি মেয়ে মনে হচ্ছে তাকে।

এরকম একটি মেয়ের সামনে ওরকম ভাষায় কথা বলতে ইচ্ছে করল না নীলুর। একপলক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে খোকনকে বলল, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

খোকন তার নিজের ভাষায়, রুক্ষ ভঙ্গিতে বলল, কই যাইবেন আমগো লগে?

মাওয়া।

আমরা মাওয়া যামু জানলেন কেমনে?

বেলাল ভাই বলেছেন। আপনারা যখন ভেতরে বসে কোল্ড ড্রিংকস খাচ্ছিলেন তখন আমি বেলাল ভাইর সঙ্গে কথা বলেছি। জিজ্ঞেস করেছিলাম গাড়িটা কোনদিকে যাবে। উনি বললেন, মাওয়ার দিকেই যাবে।

আর লগে লগে আপনে উইঠা বসলেন?

নীলু আবার হাসল। না ঠিক সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসিনি। বেলাল ভাইকে আমার সমস্যাটার কথা বললাম, শুনে উনি বললেন, এই গাড়িতে জায়গা আছে। সাহেবরা যদি নিয়ে যায় আপনি যেতে পারবেন।

লালুবাবু এবং জয়িতা অবাক হয়ে নীলুকে দেখছিল, নীলুর কথাবার্তা শুনছিল। লালুবাবু খেয়াল করেছেন কি না কে জানে, জয়িতা খেয়াল করছিল, নীলুর কথা বলার ভঙ্গি খুব সুন্দর। ভয়েসও ভাল। সুন্দর উচ্চারণে কথা বলে সে। কথা বলার সময় মুখটা থাকে হাসি হাসি। দেখতেও ভাল লাগে, শুনতেও ভাল লাগে। নীলু বেশ ম্যানলি, বেশ স্মার্ট। বসে থাকার পরও বোঝা যাচ্ছে সে বেশ লম্বা, শরীরের গড়ন সুন্দর। গায়ের রং শ্যামলা। শ্যামলা না বলে ডার্ক বললেই যেন বেশি মানাবে। অর্থাৎ ডার্ক হ্যান্ডসাম বলতে যা বোঝায় নীলু তাই। এই ধরনের পুরুষ জয়িতার বেশ ভাল লাগে। কিন্তু নীলু একবারের বেশি তার দিকে তাকায়নি, খোকনের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল।

খোকন তখন নীলুকে ছেড়ে বেলালকে নিয়ে পড়েছে। এই মিয়া, তুমি তারে গাড়িতে উঠতে কইছ?

বেলাল কাঁচুমাচু গলায় বলল, না সাব, গাড়িতে উঠতে আমি কই নাই। আপনেরা ভিতরে যাওনের পর ভাইয়ে আইসা আমারে কইল তারে ফালাইয়া বাস চইলা গেছে। বাসে তার একখান ব্যাগ রইয়া গেছে। মাওয়া যাওনের আর কোনও বাস সে পায় নাই। যুদি এই গাড়িতে আমরা তারে ইকটু নিয়া যাই তয় তার খুব উপকার হয়। আমি কইছি, আপনে খাড়ান। সাহেবরা আইলে তাগো আমি বইলা দেখুমনে। তার আগেই সে গাড়িতে উইঠা বইছে।

নীলু আগের মতোই হাসিমুখে খোকনের দিকে তাকাল। আমার এভাবে উঠে বসার আসল কারণটা আমি বলি। আপনি একটু মন দিয়ে আমার কথা শুনবেন। যে সমস্যাটা আমার হয়েছে, এই ধরনের সমস্যায় আপনাদের মতো ভদ্রলোকদের উচিত আমাকে হেলপ করা। এবং আই অ্যাম শিওর আপনারা তা করবেন। এই কারণেই আমি গাড়িতে উঠে বসেছি। এইটসিটার মাইক্রোবাস, ড্রাইভার নিয়ে আপনারা লোক মাত্র চারজন। আমি ইজিলি আপনাদের গাড়িটায় যেতে পারি। অন্য কারও কোনও অসুবিধা হবে না, সামান্য অসুবিধা শুধু আপনার হতে পারে। আপনি আগে এই সিটটায় বসেছিলেন, এখন আপনাকে বসতে হবে পেছনের সিটে। অবশ্য আপনি যদি চান আপনি এই সিটটায়ও বসতে পারেন। আমি পেছনে গিয়ে বসলাম।

নীলু এই গাড়িতে উঠে বসে আছে দৃশ্যটা ততোক্ষণে বশির আর মতির চোখেও পড়েছে। তারা দুজনও এসে দাঁড়িয়েছে মাইক্রোবাসের সামনে। নীলুর কথাবার্তা শুনে খোকন জয়িতারা যেমন হতভম্ব, বশির মতির অবস্থাও তেমন। এই ধরনের মানুষ তো তারা কখনও দেখেনি। বিপদ আপদে পড়লে মানুষ মানুষের সাহায্য চাইতেই পারে, আর গাড়িতে লিফট চাওয়ার একটা নিয়ম তো মানুষের সমাজে আছেই। কিন্তু এ তো লিফট চাইছে না, এই গাড়িতেই সে যাবে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে কাউকে কিছু না বলে গাড়িতে উঠে বসে আছে।

অন্য কোনও মতলব নেই তো?

এই প্রশ্নটা প্রথম এল ফিলিং স্টেশানের কর্মচারী মতির মাথায়। নীলুর চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, ভাই, আপনের কথাবার্তা সুবিধার লাগতাছে না।

মতির দিকে তাকিয়েও হাসল নীলু। সুবিধার লাগছে না মানে কি? আমাকে কি গুণ্ডাপাণ্ডা মাস্তান কিংবা ছিনতাইকারী মনে হচ্ছে? কিছুদূর গিয়েই কি কোমর থেকে রিভলবার বের করে গাড়ি থামাব, যার যা কিছু আছে নিয়ে রাস্তায় নেমে যাব? আমার চেহারা কি সে রকম?

ডান হাতে দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বশির বলল, চেহারা দেইখা আইজ কাইল আর লোক চিনা যায় না। আপনের থিকাও কত ভাল চেহারার ছ্যাচকা চোর দেখছি আমি।

শুনে জয়িতা খিলখিল করে হেসে উঠল। তার হাসি দেখে সবাই হাসল। নীলুর ঠোঁটেও হাসি। বলল, কথাটা মন্দ বলেননি। কিন্তু আমার প্রবলেমটা আপনারা দুজনেই জানেন। তারপরও কেন আমাকে এরকম ভাবছেন বুঝতে পারছি না।

মতি বলল, আপনে সত্য বলছেন কি না কে জানে। হইতে পারে বাস থিকা আপনে ইচ্ছা কইরাই নাইমা

গেছেন। ব্যাগবোগ কিছুই আপনের লগে আছিল না। পুরাটাই বানাইনা গল্প। আবার এমুনও হইতে পারে যেই বাসের কথা কইলেন সেই বাসেই আপনে আসেন নাই। অন্য কোনওদিক দিয়া আইসা আপনে আমগো বাথরুমে ঢুইকা গেছেন। তারপর বানাইয়া বানাইয়া গল্প কইরা আমগ এখানে বইয়া রইছিলেন এই রকম কোনও মতলবে।

আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কোন রকম মতলবের কথা বলছেন?

এই যে এইভাবে যেই গাড়ি পাইবেন সেই গাড়িতে উইঠা বসবেন।

তাতে আমার লাভ কি?

বশির বলল, কি লাভ বোঝেন নাই? খারাপ মতলব থাকলে সেই লাভ?

এবার বুঝেছি। তাহলে আপনারা একটা কাজ করুন, আমার বডিসার্চ করুন। দেখুন আমার সঙ্গে কোনও অস্ত্র-টস্ত্র আছে কি না। তবে আবারও বলছি, আমি আপনাদের সঙ্গে একটিও মিথ্যে কথা বলিনি। আই অ্যাম নট দ্যাট টাইপ।

গাড়ি থেকে নামল নীলু, দুহাত তুলে দাঁড়াল। সার্চ করুন আমাকে। তবে আমি কিন্তু ভাই এই গাড়িতেই যাচ্ছি। অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। বিকেলের মধ্যে মাওয়া না পৌঁছলে আমার একটু অসুবিধা হবে।

হাত তুলে দাঁড়াবার ফলে নীলুকে যেন আরও ম্যানলি লাগছে। জয়িতা দেখল তার অনুমানই ঠিক। বেশ লম্বা নীলু। প্রায় ছ'ফিট। জয়িতা মুগ্ধ হয়ে নীলুর দিকে তাকিয়ে রইল।

মতি বলল, খোকন ভাই, চেক করুমনি?

খোকন বিরক্ত গলায় বলল, আমার কাম কি এরে চেক করার? আমার সাফা কথা এই গাড়িতে অচেনা কোনও মানুষজন আমি নিমু না।

নীলু বলল, এখন তো আমি ভাই আপনাদের আর অচেনা না। এতক্ষণ ধরে একসঙ্গে আছি, এত কথা বলছি, নিজেকে সার্চ করবার জন্য রেডি হয়ে আছি, এত কিছুর পর মানুষ মানুষের অচেনা হয় কি করে? আর যাবোও তো আমরা এক জায়গায়ই। মাওয়া।

না মাওয়া আমরা যামু না। আমরা যামু কুমারবুগ।

কিন্তু বেলাল ভাই যে বলল মাওয়া যাবেন।

বেলাল মিনমিনে গলায় বলল, কুমারবুগ যাইতে হইলে মাওয়া চৌরাস্তা হইয়া যাইতে হয়।

আমাকে তাহলে চৌরাস্তায়ই নামিয়ে দেবেন। সেখান থেকে ইলিশ কোম্পানীর কাউন্টার খুঁজে বের করব আমি। দেখব ব্যাগটা পাওয়া যায় কি না!

জয়িতা খেয়াল করল চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ পর্যন্ত ঠিক মতো করছে নীলু।

এটা বেশ রেয়ার ঘটনা। নীলু কি কালচারাল ফিল্ডের লোক নাকি? কবিতা আবৃত্তি করে, নাকি অভিনয়। নাকি প্রোগ্রাম প্রেজেন্টার, মুম্বাইয়ের লোকরা যাকে বলে ভি জে!

আর খোকনের সন্দেহ হল নীলু মাওয়া এলাকাটা ঠিক চেনে না। বোধহয় এই প্রথম যাচ্ছে।

কথাটা সে জিজ্ঞেস করল। আপনে কি আগে কোনওদিন মাওয়া গেছেন?

নীলু বলল, তার আগে হাত দুইটা নামাই ভাই। বুঝে গেছি সার্চ-ফার্চ আপনারা করবেন না। অযথা আমি হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছি।

কথা বলার ফাঁকেই হাত নামিয়ে ফেলেছে নীলু। খোকনের দিকে তাকিয়ে আবার তার সেই লোক পটানো হাসিটা হাসল। আপনার নামটা আমি এতক্ষণে জেনে ফেলেছি। খোকন। খোকন নামের দারুণ একটা সুবিধা

আছে ভাই। এই নামের লোকরা কোনওদিন বড় হয় না। তারা সবসময় খোকাই থাকে।

শুনে জয়িতা ঠোঁট টিপে হাসল। হাসিটা খেয়াল করল নীলু। কিন্তু ওই নিয়ে কথা বলল না। খোকনের দিকে তাকিয়ে বলল, সারাজীবন খোকা থাকা বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার। আপনি সেই সৌভাগ্যবান লোক খোকন ভাই। ভাববেন না আপনাকে তেল দিচ্ছি। আমি আমার ফিলিংসটা বললাম। যা হোক আপনার প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে, আমি আগে কোনওদিন মাওয়া যাইনি। এই প্রথম। তবে মাওয়া জায়গাটা খুবই ভেজালের মনে হচ্ছে। আমার জন্য খুবই আনলাকি। ব্যাগ রয়ে গেল বাসে, নিজে পড়ে রইলাম তালুকদার ফিলিং স্টেশানে। এইটুকু রাস্তা যাওয়ার জন্য কত কথা খরচ করতে হচ্ছে। ছোটখাট অপমান পর্যন্ত সহ্য করছি।

খোকন বলল, আপনে মাওয়াই যাইবেন না অন্য কোনও গ্রামে? কোন গ্রামে, কার কাছে যাইবেন কন তো?

এখানে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। চলুন গাড়িতে উঠি। যেতে যেতে সব কথা বলি। আপনার নাম নিয়ে ইন্টারেস্টিং একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে আমার। শুনতে সবারই ভাল লাগবে।

এই প্রথম লালুবাবু কথা বললেন। খোকন রে, দাদা, লইয়া লও। পোলা খারাপ মনে হইতাছে না।

নীলু হাসল। লালুবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঠিক তার ভাষায় তার মত করে বলল, হ হ খোকন ভাই, আমি পোলা খারাপ না।

নীলুর কথা বলার ভঙ্গিতে জয়িতা তো আছেই, খোকন পর্যন্ত তার যাবতীয় রাগগাম্ভীর্য ভুলে হেসে ফেলল। নারে ভাই, আপনের লগে পারা যাইব না। আপনি কঠিন জিনিস। ওঠেন গাড়িতে ওঠেন।

নীলু সত্যি সত্যি তাদের সঙ্গে যাচ্ছে এতে সবচেয়ে বেশি খুশি হল জয়িতা।

নীপেশ তালুকদার এমন একজন মানুষ যাকে দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়।

ওয়াদুদ খানেরও মন ভাল হয়ে গেল। বাংলাদেশ বিমানের কলকাতা ঢাকার এই ফ্লাইটটা প্রায়ই ডিলে করে। আজ করেছে পঞ্চাশ মিনিট। যে সময়ে ল্যান্ড করার কথা ওয়াদুদ খান এয়ারপোর্টে এসেছে তার মিনিট বিশেক আগে। হুমায়ূন হাফিজ কাস্টমসের প্রভাবশালী অফিসার। সে ব্যবস্থা করে রেখেছে, লালুবাবু আর জয়িতা যেভাবে গ্রিন চ্যানেল দিয়ে বেরিয়ে এসেছে নীপেশ তালুকদার আর তার স্ত্রীও সেভাবেই বেরিয়ে আসবেন।

কিন্তু প্লেন পঞ্চাশ মিনিট ডিলে। এদিকে বিশ মিনিট আর ওদিকে পঞ্চাশ, মোট সত্তর মিনিট। অর্থাৎ একঘণ্টা দশ মিনিট। তার ওপর গ্রিন চ্যানেল হোক আর যে চ্যানেলই হোক আরও বিশ-তিরিশ মিনিট তো লাগবেই বেরিয়ে আসতে। সব মিলিয়ে দেড়-পৌনে দু'ঘণ্টার ফের। তারপর এয়ারপোর্ট থেকে পুরানা পল্টন, গ্র্যান্ড আজাদ হোটেল। কমপক্ষে একঘণ্টা। যানজট নামের দৈত্যটা তো আছেই। বিকেল শেষ হয়ে যাবে। হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ-ট্রেশ হয়ে বিকেলের চা-নাশতা খেয়ে তারপর আবার গাড়িতে ওঠ, চল বিক্রমপুর। রাত ক'টা বাজবে পৌঁছাতে কে জানে। কিন্তু পৌঁছাতে হবে আজকেই। কাল সকাল থেকে প্রোগ্রাম। আজ গ্রামে গিয়ে না থাকলে সকালবেলা ভজঘট লেগে যাবে। ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে হুড়াহুড়ি করে ওঠ, গোসল ইত্যাদি সারতে সারতে বেলা উঠে যাবে। না সেই রিস্ক কিছুতেই নেয়া যাবে না। ওয়াদুদ খানের কাঁধে অনুষ্ঠানের একটা বড় দায়িত্বও আছে। কলকাতা থেকে যেসব গেস্ট এসেছেন অনুষ্ঠানের শুরুতেই তাদের সবাইকে মঞ্চে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ওয়াদুদ খান মঞ্চের লোক নন। একটু প্রিপারেশান নিতে হবে। কতটা ভালভাবে করা যাবে কাজটা। যদি ভালভাবে প্রেজেন্ট করা না যায় লোকে হাসাহাসি করবে। সামনাসামনি না হোক আড়ালে-আবডালে তো করবেই। তিনি এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তার বাবা হাকিম খান পাকিস্তান আমলের বড়লোক, নামকরা লোক। তারা প্রতিটি ভাইই পয়সাঅলা এবং নামকরা। সুতরাং নাম নষ্ট করবার কোনও অবকাশ নেই। আজ আবার সঙ্গেও কেউ নেই ওয়াদুদ খানের। লালুবাবু আর জয়িতাকে নিতে আসার সময় খোকন ছিল সঙ্গে, প্লেনও ডিলে করেনি। সময়টা ভালই কেটে গেছে। আজ সঙ্গে কেউ নেই। লালুবাবুদের নিয়ে খোকন চলে গেছে বিক্রমপুরে। দেলোয়ার হোসেন খান হাসুকে যে সঙ্গে আনবেন সেই উপায়ও নেই। একেকজন ব্যস্ত হয়ে আছে একেক কাজে। হুমায়ূন হাফিজ গেস্টদের ক্রেস্ট আর উদযাপন

কমিটির সদস্যদের ব্লেজারের দায়িত্বে। সংকলনের জন্য প্রচুর বিজ্ঞাপনও জোগাড় করে দিয়েছে। অসাধারণ কাজের লোক। সৎ সিনসিয়ার পরিশ্রমী। আরেক পরিশ্রমী যুবক দেলোয়ার হোসেন হাসু। মাস দুয়েক ধরে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য সব ফেলে স্কুলের অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে। সব কাজেই আছে হাসু। এই কাজির পাগলা চলে যাচ্ছে, এই ওটা করছে। দেদার খরচা করছে নিজের পকেটের পয়সা। কোনও দিকে তাকাচ্ছে না। জামাল খান তো দু'বার কলকাতাই গেল প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের লোকজনদেরকে দাওয়াত করতে। শেষবার ওসমান গনী তালুকদার, আবুল বাসার, ওয়াদুদ খান তিনজন কালনা পর্যন্ত গেল জলধর ডাক্তারকে দাওয়াত করতে। ওদিকে আবদুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন কে এম নজিব, বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন-অর-রশিদ চৌধুরী, লিয়াকত হোসেন, নুরুদ্দিন ভাই, বাহনদা, নূরী আবদুর রহমান, ডি এম কাদের, গুপ্ত। মফিজুর রহমান মোস্তাক নামে একটা ছেলে, ইস কি যে পরিশ্রম সবাই করছে। নিজ এলাকার একটি স্কুলের জন্য এত মায়া কে কবে কোথায় দেখেছে কে জানে। আর আলী আহমেদ তো ইমদাদুল হক মিলনকে নিয়ে নাওয়া-খাওয়া, স্কুলের চাকরি সব বাদ দিয়ে সংকলন ছাপা নিয়েই আছে। চাররাত নাকি বাড়িই ফেরেনি। পুরানা পল্টনের মিউচুয়্যাল গ্রাফিক স্ক্যানে বসে সংকলনের কাজ করেছে।

আজ বিকেলের মধ্যে গেস্টরা সব পৌঁছাবে বলে এত ব্যস্ততার মধ্যেও একেকজন একেকদিকে চলে গেছে তাদেরকে রিসিভ করতে। একটা বড়দল গত দু'দিন ধরে কাজির পাগলা গিয়ে পড়ে আছে। স্টেজ লাইটিং প্যান্ডেল ওসব নিয়ে ব্যস্ত। মমতাজ আসবে গান গাইতে শোনার পর ভয়াবহ উৎসাহ তৈরী হয়েছে সারা বিক্রমপুরে। দ্বিতীয় দিন হাজার বিশেক লোক হবে অনুমান করছে সবাই। আল্লাহই জানেন, কীভাবে সামাল দেয়া যাবে। তার ওপর আছে লোকাল পলিটিক্স। আওয়ামী লীগ-বিএনপি। সিকিউরিটির ব্যাপার আছে। প্রশাসনের ওপর লেভেল পর্যন্ত ইনফর্ম করা আছে। দেখা যাক।

ইস এই জায়গাটা আবার নো স্মোকিং জোন। একটা সিগ্রেট খেতে পারলে ভাল হতো। টয়লেটে গিয়ে খেয়ে আসব নাকি!

এ সময় মোবাইল বাজলো। একটা কিছু কাজ পাওয়া গেছে দেখে ব্যস্ত ভঙ্গিতে কোটের পকেট থেকে নোকিয়া মোবাইল সেট বের করলেন ওয়াদুদ খান। স্ক্রিনে দেখলেন ওসমান গনী তালুকদারের নাম। মুখটা হাসিতে ভরে গেল তাঁর। একটু উচ্চস্বরে কথা বলার স্বভাব। বললেন, গনীদা, আপনে কই?

কন তো কই?

কেমতে কমু? বাড়িত গেছেন গা নি?

আরে নারে দাদা। কমলাপুর বাস টার্মিনালে আইসা বইসা রইছি। দিপালী নাগ আর তার গানের দল আইবো না? তাগো রিসিভ করতে আইছি।

দুইজন তো তাইলে একই কামে আছি। আমি আইছি এয়ারপোর্টে। ওই যে নীপেশদা আইবো।

জানি। এখনও আসে নাই?

নারে ভাই। প্লেন ডিলে করতাছে।

হইছে কাম। আমার বাসও তো ডিলে।

আল্লায়ই জানে কপালে আইজ কী আছে। টাইম মতন বাড়িত যাইতে পারুমনি?

এত চিন্তা কইরেন না! দেখবেন সবই ঠিকঠাক মতন হইয়া যাইবো আল্লার রহমতে। এত মানুষের পরিশ্রম কোনওদিন বিফল হয় না। দেরি হোক আর যাই হোক আইজ রাইতেই বিক্রমপুর গিয়া পৌঁছাইতে হইবো। নাইলে সকালবেলা কেলেঙ্কারি হইয়া যাইবো।

শোনেন লালুদা আর তার নাতিনরে আপনের বাড়িতে পাঠাইয়া দিছি। নীপেশ তালুকদার আর বউদি থাকবো মেদিন মণ্ডল, আউয়াল তালুকদারের বাড়িতে। শ্যামলাল থাকবো আমগ বাড়িতে, কুসুমকান্তিও আউয়াল তালুকদারের বাড়িতে। দিপালী নাগ তাঁর দলবল নিয়া আপনের বাড়িতে। বাসারগ বাড়িতেও থাকবো

অনেকে।

আরে এইগুলি জানি। ওই যে কইলকাতার বাস আইসা পড়ছে। আমি দিপালী নাগরে নিয়া হোটেলে গেলাম। আপনে আসেন।

এসবের কিছুক্ষণ পর নীপেশ তালুকদারও এসে পড়লেন। পরনে গাঢ় নীল ব্লেজার আর বিস্কিট রংয়ের প্যান্ট। আকাশি রংয়ের শার্টের সঙ্গে মেরুনের ওপর সাদা বুটিদার টাই। পায়ে চকচকে কালো জুতো। মাথার কোঁকড়ানো চুল এই বয়সেও ঈর্ষণীয় ঘন। তবে নব্বুই ভাগই সাদা। টকটকে ফর্সা গায়ের রং, মাঝারি হাইটের মানুষ। সেমি, ব্যক্তিত্বময়। স্ত্রী রত্নও তাঁর সঙ্গে বেশ মানানসই। চমৎকার জুটি। ওয়াদুদ খানকে দেখেই বিনম্র ভঙ্গিতে নমস্কার করলেন দুজনে। ওয়াদুদ খানের মন ভাল হয়ে গেল। প্লেনে কোনও অসুবিধা হয় নাই তো দাদা?

না। ওই একটু ডিলে আর কী! আপনার বউদি বলছিলেন, আপনারা এসে এয়ারপোর্টে ওয়েট করছেন, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে।

ওয়াদুদ খান হাসলেন। আমার লগে কেউ নাই। আমি একলা।

বউদি বললেন, তবে তো আরও কষ্ট। একা একা ওয়েট করা যায় নাকি?

কী করুম কন? কেউরে পাই নাই। সবাই ব্যস্ত। চলেন।

গাড়ির কাছে আসতে আসতে ওয়াদুদ খান বললেন, আপনেগ উপরেও চাপ কম পড়ব না। কলকাতা থিকা ঢাকা আইসা নামনের পরপরই রওনা দিতে হইব।

নীপেশ তালুকদার বললেন, মানে?

আইজই বিক্রমপুর চইলা যামু আমরা।

কতক্ষণ লাগবে যেতে?

বেশি না। ঘণ্টাখানি।

ও এ আর এমন কী?

বউদি বললেন, তাহলে আমাদের ব্যাপারটা দাঁড়াল দিল্লি-কলকাতা, কলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-বিক্রমপুর।

ওয়াদুদ খান চমকালেন। আপনেরা আইজই দিল্লি থিকা আইছেননি?

নীপেশ তালুকদার স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে হাসলেন। হ্যাঁ। কোনও অসুবিধে নেই। আমি জার্নি করে অভ্যস্ত। সারাজীবন বিদেশে কাজ করেছি। সতেরো আঠারো বছর ছিলাম রিয়াদে। এখন রিটায়ারড লাইফ। দিল্লিতে ছোট্ট একটা বাড়ি করেছি। ছেলেমেয়ে দুটোও সঙ্গে থাকে না। আছি শুধু আমি আর আপনের বউদি। একেবারেই ব্যস্ততাহীন জীবন। সুতরাং হঠাৎ হঠাৎ ব্যস্ত হতে ভালই লাগে।

নীপেশ তালুকদারের কথা শুনে এই দম্পতির দিল্লির জীবনটা যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন ওয়াদুদ খান। ছোট্ট দোতলা একটা বাড়ি। নিচে ড্রয়িংরুম, ডাইনিংরুম। ওপরে দু তিনখানা শোবার ঘর। একটি ঘরে স্বামী স্ত্রী থাকেন অন্য ঘরগুলো খালি পড়ে আছে। ছেলেমেয়েরা এসে থাকে। বাড়িতে মধ্যবয়সি একজন কাজের লোক। তাও পুরুষমানুষ। সে একাই বাড়ির পুরো কাজ সামলাচ্ছে। বাজার করছে, রান্না করছে, জামাকাপড় নিয়ে লন্ড্রিতে ছুটছে, ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, চা করছে। আর দুজন মানুষের কোনও কাজ নেই। তারা দুজন খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে। কোনও কোনওদিন কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। অতি একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর জীবন। এরকম জীবন কি ওয়াদুদ খানের কখনও হবে? ওরকম একঘেয়ে ক্লান্তিকর রিটায়ারমেন্ট বলে কিছু আছে?

এসব ভাবতে ভাবতে নিজের শেষজীবনের একটা ছবি কল্পনায় দেখার চেষ্টা করলেন ওয়াদুদ খান। কিছুই দেখতে পেলেন না।

এই যে দাদা, ছুনুন।

দিপালী নাগের গলা মোটা ধাঁচের। পুরুষালী। মুখের দিকে না তাকালে বোঝা যায় না পুরুষ কথা বলছে না মহিলা। তবু তাঁর গলা শুনতে পেলেন না ওসমান গনী তালুকদার। দাঁড়িয়েছিলেন কাছাকাছিই, বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলেন। তাঁর পরনে অ্যাশ কালারের স্যুট, পায়ে চকচকে কালো জুতো। সাদা শার্টের সঙ্গে গাঢ় নীল রংয়ের টাই পরেছেন। চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা। গা থেকে ভুর ভুর করে আসছে দামি পারফিউমের গন্ধ। বিআরটিসির ঢাকা কলকাতা বাস টার্মিনালের এই পরিবেশে তাকে একটু বেমানান লাগছে।

দিপালী নাগের সঙ্গে চারজন মহিলা আর একজন পুরুষ। পুরুষটি লম্বা, রোগা পটকা ধরনের। মাথায় টাক প্রায় পড়ে এসেছে। ফুরফুরে পাতলা চুল আকৃতিতে বড় করে টাক সামলাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। সুবিধা করতে পারছে না। চুলের ফাঁক ফোকর দিয়ে তালুক এদিক ওদিক চকচক করছে। ভাঙাচোরা মুখ নিখুঁত করে কামানো। মুখ দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। চল্লিশ পঞ্চাশ যে কোনওটাই হতে পারে। তার বেশি কিংবা কম হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। পরনে সাদা পাজামা, গেরুয়া রংয়ের পাঞ্জাবি আর একখানা কটি। কটির রংও পাঞ্জাবির মতোই। সবকিছু মিলিয়ে যাত্রাদলের অধিকারিদের মতো চেহারা। চোখে মুখে সারাক্ষণই সন্ত্রস্ত একটা ভাব আছে লোকটির। সে ব্যস্ত ভঙ্গিতে বাসের কেরিয়ার থেকে ব্যাগ স্যুটকেস নামাচ্ছিল। মহিলা চারজন তার সামনে ভিড় করে আছে।

দিপালী নাগ ছিলেন দূরে। ওসমান গনী তালুকদার তাঁর গলা শুনতে পাননি দেখে এগিয়ে এলেন। এই যে কালো মানিক, ছুনুন। তাকান আমার দিকে।

চমকে দিপালী নাগের দিকে তাকালেন ওসমান গনী তালুকদার। হাসলেন। স্লামালেকুম দিদি। আপনেরেই তো বিচড়াইতাছি।

দিপালী নাগ টনটনে গলায় বললেন, আমি ছোটখাট মানুষ, এজন্যে বোধহয় চোখে পড়ছিলুম না।

দিপালি নাগ বাস্তবিকই ছোটখাট মানুষ। যেমন রোগা তেমনি বেঁটে। সাড়ে চার ফিটের বেশি লম্বা হবেন না। অতিরিক্ত ফর্সা গায়ের রং। কটা কটা চেহারা। গাল গলার চামড়া কুঁচকে গেছে। আশির কম হবে না বয়স। তবু কী তেজস্বিনী। বাসে করে কলকাতা থেকে ঢাকা চলে এসেছেন দলবল নিয়ে। স্কুলের অনুষ্ঠানে এটেন্ড করবেন, গান গাইবেন। পূর্বপুরুষদের কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।

তাঁর মাথায় এখনও বেশ ঘনচুল। চুল এবং ভুরু কুচকুচে কালো। চোখে গাঢ় করে কাজল দিয়েছেন, ঠোঁটে নেচারাল কালারের লিপস্টিক। বাস থেকে নামার আগে নিশ্চয় নিজেকে পরিপাটি করেছেন। পরনে লালকালোর মিশেল দেয়া চওড়া পাড়ের সাদা সুতি শাড়ি। লম্বা হাতার কালো ব্লাউজ। তার ওপর মেরুন রংয়ের মোটা একখানা শাল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের কায়দায় ফেলা। বোঝা যায় খুবই স্টাইলিস মহিলা। সাইজে ছোট হয়েও জাঁদরেল সুন্দরী ছিলেন এককালে। গলায় আবার আজকালকার যুবতীদের মতো তামা রংয়ের বড় একখানা লকেট ঝুলিয়েছেন।

ওসমান গনী তালুকদার বললেন, আপনে জানি আমারে কী নামে ডাকলেন দিদি?

দিপালী হাসলেন। শুনলে আবার রাগ করবেন না তো!

তা করুম না। তয় এই কথাটায় করতাছি।

কোন কথা গো?

এই যে আপনে আপনে করতাছেন। কইলকাতায় তো তুমি কইরা বলছেন।

তাই নাকি? ওই দ্যাখো, ভুলে গিয়েছিলুম। কী করবো দাদা, আজকাল অনেক কথাই মনে রাখতে পারি না। আশির ওপর বয়েস হলো।

ভারী অবাক হলেন। আশির উপরে! কন কী?

হ্যাঁ।

তয় আপনেরে এত বুড়া মনে হয় না।

দিপালী হাসলেন। সাজগোছ দিয়ে বয়েসটা লুকিয়ে রাকচি।

এইবার কন কী নামে ডাকলেন আমারে। রাগ করুম না, কন।

কালো মানিক। তোমার গায়ের রংখান দাদা ভগবান কৃষ্ণের মতো। এইজন্যে ওই নামে ডাকলুম।

বুজছি। আপনে আমার আসল নাম ভুইলা গেছেন।

দিপালী লাজুক মুখে মাথা নাড়লেন।

আমার নাম ওসমান গনী। পদবি আপনেগ মতন।

নাগ?

আরে না। মোসলমানগ নাগ পদবি হয়নি?

তাই তো বলি।

আমরাও আপনেগ বাপদাদার মতন তালুকদার। ওসমান গনী তালুকদার। তয় যেই নামে আপনে আমারে ডাকছেন প্রায় ওই রকম আমার একখান ডাকনাম আছে।

কী বলো তো?

কালন।

বাহ। কালন অর্থ হচ্ছে গিয়ে কালো। কৃষ্ণ। আমি দাদা তোমাকে তাহলে এই নামেই ডাকবো। কালোই হচ্ছে জগতের আসল রং। কথায় বলে, কালো, জগতের আলো।

এ সময় চার মহিলা আর এক পুরুষের দলটি ব্যাগ স্যুটকেস নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। গনী এই প্রথম মহিলা চারজনকে খেয়াল করলেন। চারজনেরই শরীর স্বাস্থ্য, হাইট, পোশাক আশাক প্রায় একরকম। চারজনই মোটা টাইপের এবং বেঁটে। দিপালী নাগের তুলনায় এক দেড় ইঞ্চি উঁচু হতে পারে। অতি সাধারণ, সাদামাটা চেহারা। কারও চেহারায় আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। সস্তা ধরনের সুতি শাড়ি পরা। আর একটি ব্যাপার গনীর চোখে পড়ল, চারজনেরই শাড়ির রং হলুদের কাছাকাছি। কারওটা পুরোপুরিই হলুদ, কারওটা হালকা হলুদ কিংবা হলুদের ছাট আছে। তবে এরা যে একদলের, একপলকে যে কেউ তা বুঝে যাবে।

দিপালী বললেন, এই হচ্ছে গিয়ে আমার দল। কলকাতায় তোমাদেরকে বলেছিলুম না, আমি আমার পাঁচজনের দল নিয়ে যাবো! ওরা পাঁচজন আর আমি এক, এই হলুম গিয়ে ছজনা। তবে গান কিন্তু ছজনায় করি না, করি পাঁচজনায়। ওই চারটি মেয়ে আর আমি। এটিকে তুমি নারী বাহিনী বলতে পার।

গনী ভুরু কুঁচকে বললেন, তাইলে এই ভদ্রলোক করেন কী?

কিছুই করে না।

জি ?

হ্যাঁ। ও হচ্ছে গিয়ে আমাদের তল্পিবাহক।

তল্পিবাহক কথাটা শুনে গনী হাসলেন।

দিপালী বললেন, দলে পুরুষ একটা লাগে, বুজলে না? কলকাতার বাইরে টাইরে প্রোগ্রাম করতে যাই, সঙ্গে

ডবকা চারটি মেয়ে, তাদের দেখভাল করার জন্য পুরুষ একটা লাগে।

লোকটিকে ডাকলেন দিপালী। পবনে, ইদিকে আয়। পরিচয় করিয়ে দিই।

লোকটি তটস্থ ভঙ্গিতে ছুটে এলো।

গনীকে দেখিয়ে দিপালী বললেন, একে চিনে নে। এ হস্তে গিয়ে আমাদের গনীদা। এখানকার সর্বেসর্বা।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে অতি বিনয়ী ভঙ্গিতে দুহাত জড়ো করল। নমস্কার, নমস্কার।

গনী নমস্কারের জবাব দেয়ার সুযোগ পেলেন না। দিপালী বললেন, আর ও হচ্ছে গিয়ে পবনে। মানে পবন, পবন মালাকার। আমি আদর করে পবনে বলে ডাকি।

গনী হাসিমুখে বললেন, সোন্দর নাম।

তবে নাম হচ্ছে গিয়ে তোমার দাদা, বুজলে! কালন। কৃষ্ণ কালো গাত্রবরন, নামখানি তার কালন। অসাধারণ।

পবন অবাক গলায় বলল, এইমাত্র যেন অন্য কী একখানা নাম বললেন?

দিপালী খরচোখে পবনের দিকে তাকালেন। পবন সঙ্গে সঙ্গে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেল। মাথা নীচু করে বলল, সে না হয় ঠিক আছে। আমি পরে জেনে নোবোক্ষণ।

কেন, একবার যে বললুম, এর মধ্যেই ভুল মেরে দিলি। তুই আসলেই একটা গোবর গনেশ। আজতক দেখলুম না কারও নাম মনে রাখতে পেরেছিস। শোন, আবার বলচি। দাদাটির নাম হচ্ছে গিয়ে গনী। আমি ডাকছি কালন নামে। ওটা ওর ডাকনাম। তোরা ডাকবি গনীদা বলে। ঠিক আছে?

পবনের সঙ্গে মহিলা চারজনও মাথা নাড়ল।

দিপালী গনীর দিকে তাকালেন। এবার মেয়েগুলোর সঙ্গে পরিচিত হও দাদা।

থাবা দিয়ে হাতের কাছের মহিলাটির একটা হাত ধরলেন তিনি। এটি হচ্ছে শিউলি। শিউলি বিশ্বাস। ওই হচ্ছে কনক দাস। তিন নম্বরটি শিল্পী সরকার। গলাখানা ভগবানের দয়ায় অসাধারণ। গান শুনলে মনে হবে স্বর্গ থেকে ভেসে আসছে কোনও দেবীমায়ের কণ্ঠস্বর। আর ওই যে মুখপুড়ি, ওটাকে আমি সবচাইতে বেশি আদর করি, ওই চার নম্বরটি, ওটির নাম বনানী মিত্র। সুচিত্রা মিত্রের লতায় পাতায় আত্মীয়া।

পরিচয়ের সময় প্রত্যেকেই গনীকে হাতজোড় করে নমস্কার করছিল। গনী হাসি হাসিমুখে তাকাচ্ছিলেন তাদের দিকে। পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, দিদিরা, আমি বিক্রমপুরের ভাষায় কথা বলি। এইটাই আমার অভ্যাস। কিছু মনে করবেন না। তয় বাংলাদেশে যখন আসলেনই, দাদাগও লগে লইয়াসতেন। বাচ্চাকাচ্চাগ লগে লইয়াসতেন। দেশটা তারা দেইখা যাইতো। বাসের টিকেটের তো দাম বেশি না। কইলে আমরাই টিকেট পাঠাইয়া দিতাম।

গনীর কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল চারজন। তাদের সঙ্গে প্রায় গলা মিলিয়ে হাসল পবন। দিপালী নাগও হাসছিলেন কিন্তু নিঃশব্দে।

একথায় হাসির কী হলো বুঝতে পারলেন না গনী। তিনি হাসিমুখে ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

শিউলন নামের মহিলাটি হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের ওছব নেই দাদা।

নেই মানি?

শিল্পী বললেন, নেই মানে হয়নি কো।

কী হয়নি?

বিয়ে। বিয়ে হয়নি।

বলেন কী?

বনানী হাসতে হাসতে বললেন, বিয়ে হলে তবে না আপনার দাদা হবেন, দাদার কল্যাণে বাচ্চাকাচ্চা হবে।

গনী বুঝতে পারছিলেন না এতটা বয়সেও বিয়ে তাদের কেন হয়নি। তিনি একটু ঠোঁটকাটা স্বভাবের মানুষ। কথা যা বোঝেন সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলেন।

এখনও বললেন। এত বয়েস হইছে তাও বিয়া হয় নাই ক্যান আপনেগ? আমি জানি জাতে না মিললে হিন্দু মাইয়াগ সহাজে বিয়া হয় না। তয় আপনেরা তো বুড়া হইয়া যাইতাছেন। আর বিয়া হইব কবে?

গনীর একথায়ও তাঁরা আগের মতো হাসতে লাগলেন।

দিপালী বললেন, আরে নারে দাদা, দেখতে যত বয়স্কই মনে হোক, আসলে ওদের তেমন বয়েস হয়নি। সবকটিই পুচকে। বাইশ চব্বিশের বেশি বয়েস না একটারও।

বলেন কী! তাইলে তো সবাইরেই আমি তুমি কইরা বলতে পারি।

অবশ্যই। তাইতো বলবে। ওরা শিল্পী মানুষ, কেউ ফিগার টিগারের কথা ভাবে না। শুধু খায় আর ঘুমায়, এজন্যে এই দশা একেকটির। মোটকা সোটকা হয়ে গেছে।

কিন্তু আপনে তো ঠিকই আপনের ফিগার মেনটেইন করছেন দিদি। আশি বছর বয়সেও...

গনীর কথা শেষ হওয়ার আগেই দিপালী নাগ বললেন, এখন ছুড়ি রয়ে গেছি, নাকি?

গনী জবাব দিলেন না, হাসতে লাগলেন।

দিপালী বললেন, এখন আমরা যাবো কোথায়?

আগে হোটেলে চলেন। ওইখানে ফ্রেশ ট্রেশ হইয়া চা খাইলেন, তারপর রওনা দিলেন।

আজই বিক্রমপুর চলে যাবো?

জি।

ঠিক আছে, চলো তাহলে। গাড়ি আছে সঙ্গে? এক গাড়িতে যাওয়া যাবে?

জি যাইবো। মাইক্রোবাস নিয়াসছি। এইট সিটার।

ভেরিগুড। কোথায়, গাড়ি কোথায়?

সামনের রাস্তায়।

ভেরি গুড।

গনীর পিছু পিছু যে যার ব্যাগ স্যুটকেস নিয়ে টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এলো।

ষোলঘর পেরিয়ে যাচ্ছে মাইক্রোবাস, নীলু হঠাৎই পেছন দিকে মুখ ফেরাল। খোকনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব খোকন ভাই?

কপালে দুতিনটা ভাঁজ ফেলল খোকন। কী?

আমরা কি ষোলঘর গ্রামটা ফেলে এলাম, না পেরিয়ে যাচ্ছি?

আপনে বলে এই প্রথম বিক্রমপুরে আসলেন?

হ্যাঁ।

তয় বুজলেন কেমনে যে আমরা ষোল্লঘর ছাড়াইয়া যাইতাছি!

খোকনের কথা শুনে চোখ দুটো চকচক করে উঠল নীলুর, মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল। সত্যি আমরা ষোলঘর ছাড়িয়ে যাচ্ছি! দাঁড়ান দাঁড়ান আগে জায়গাটা দেখি তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

মাইক্রোবাসের জানালা দিয়ে মুগ্ধচোখে বাইরে তাকিয়ে রইল নীলু। কিন্তু গ্রাম বলতে তেমন কিছু তার চোখে পড়ল না। কেমন রুক্ষ পরিবেশ চারদিকে। রাস্তার ধারে অজস্র দোকানপাট, বাজার। গ্রামের ভেতরদিকে চলে যাওয়া রাস্তায় রিকশা চলছে, লোকজনের কমতি নেই কোথাও।

এই সেই বিখ্যাত ষোলঘর?

নীলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে দেশগ্রামও বদলে গেছে। বিক্রমপুরের উপর দিয়ে ঢাকা খুলনা মহাসড়ক চলে যাওয়ার ফলে এলাকার যেমন উন্নতি হয়েছে তেমন সর্বনাশও হয়েছে। বিক্রমপুর এখন আর বিক্রমপুর নেই, বিক্রমপুর শহর হয়ে গেছে। বিক্রমপুরের গ্রামগুলোও এখন আর গ্রাম নেই, উপশহর হয়ে গেছে। গ্রামে ইলেকট্রিসিটি ঢুকলে গ্রাম কি আর গ্রাম থাকে! পাকা রাস্তাই যদি থাকল তাহলে আর গ্রাম কী? গ্রাম মানে সড়ক হালট, গাছপালা ঘেরা নির্জনতা, পদ্ম ফোটা পুকুর দীঘি, বাঁশঝাড়ে শন শন হাওয়া, দুপুরবেলা ঘুঘুর ডাক আর আকাশের তলায় পড়ে থাকা ফসলের মাঠ। কই এসব তো বিক্রমপুরে আর চোখেই পড়ে না। বিক্রমপুরের সে আদি ঐতিহ্য, চৌচালা পাটাতন করা টিনের ঘর, সেইসব ঘরও তো আর চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং। কানে আসে কাঁচা টাকার ঝনঝনানি। বিক্রমপুর এখন বাংলাদেশের সবচে' ধনী এলাকা। কাপড়ের ব্যবসা একচেটিয়া বিক্রমপুরের লোকদের হাতে। বিক্রমপুরের যুবক ছেলেরা ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় দেশে। জাপান কোরিয়া, ইংল্যান্ড আমেরিকা, ইতালি সুইজারল্যান্ড আর পুরো মিডিলইস্ট বিক্রমপুরের যুবকদের দখলে। ওইসব দেশ থেকে মাসে কোটি কোটি টাকা এসে বিক্রমপুরে ঢুকছে। ফলে প্রতিদিনই বদলে যাচ্ছে এলাকার চেহারা। টাকার গরমে জৌলুস বাড়ছে বিক্রমপুরের, একদিকে যেমন বেজায় উন্নতি হচ্ছে আরেক দিকে অবনতিও হচ্ছে। বিক্রমপুরের আসল শক্তি যেটা ছিল, শিক্ষা, সেই শিক্ষাটা নষ্ট হয়ে গেছে। শিক্ষাটা এখন আর নেই। বিক্রমপুরের ছেলেরা এখন আর লেখাপড়া করতে চায় না, বিদেশে চলে যায়। মেয়েরা পড়াশুনার কথা না ভেবে বিদেশে বসবাস করা যুবকদের স্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে।

খোকন বলল, কী হইল? কথার জব দিলেন না?

নীলু পিছন ফিরে তাকাল। মুখখানি যথারীতি হাসিমাখা। আমি বিক্রমপুরে এই প্রথম এলাম ঠিকই কিন্তু আমি হচ্ছি বিক্রমপুরের ব্যাপারে মাস্টার। দুটো ব্যাপারে আপনি আমাকে মাস্টার বলতে পারেন। এক, বিক্রমপুর। দুই, রবীন্দ্রসঙ্গীত। এই যে ষোলঘর গ্রামটি আমরা পেরিয়ে এলাম এই গ্রামে জন্মেছিলেন লেখক প্রতিভা বসু।

প্রতিভা বসু নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হলেন লালুবাবু। আরে তাই নাকি? কী কয়? ষোল্লঘর প্রতিভা বসুর গ্রাম? বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী!

নীলু অবাক হলো। আরে, আপনি তো বেশ ভাল খোঁজখবর রাখেন। হ্যাঁ প্রতিভা বসু বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী। তাঁর ডাকনাম রানু। বিয়ের আগে পদবি ছিল সোম। রানু সোম। যৌবনকালে বিখ্যাত সুন্দরী, বিখ্যাত গায়িকা। ঢাকার ওয়ারিতে থাকতেন। কাজী নজরুল ইসলামের কাছে গান শিখেছেন কিছুদিন। শোনা যায় রানু সোমকে নিয়ে বিদ্রোহী কবির খুবই উৎসাহ ছিল। এসব নিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর বন্ধুবান্ধব নিয়ে নজরুলের সঙ্গে নাকি ঝগড়াঝাটিও করেছেন। অর্থাৎ প্রেম ভালবাসা সংক্রান্ত জেলাসি। আজকালকার দিনের মতোই।

নীলুর কথা শুনতে সবচে' ভাল লাগছিল জয়িতার। কী সুন্দর করে কথা বলছে, উচ্চারণ কী সুন্দর। আর জানে কত কী!

লালুবাবুও খুবই আগ্রহ নিয়ে শুনছেন নীলুর কথা। শুধু খোকনের কোনও উৎসাহ নেই। বেলাল এসব কথা শুনছে কি শুনছে না বোঝা যাচ্ছে না, সে আপনমনে গাড়ি চালাচ্ছে।

নীলু বলল, বহু গল্প উপন্যাস লিখেছেন প্রতিভা বসু। তাঁর বিখ্যাত বই 'জীবনের জলছবি'। ওটা আত্মজীবনী।

ওই বইতে ষোলঘরের কথা আছে। তাঁর উপন্যাস নিয়ে অনেক সিনেমা হয়েছে কলকাতায়। যেমন ‘অতল জলের আহ্বান’। ওই ছবিতে বিখ্যাত একটা গান আছে।

জয়িতা আচমকা বলল, আমি জানি। ‘ভুল সবই ভুল। এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা’।

শুনে মুগ্ধ হলো নীলু। আরে, দারুণ তো! ছবিটা আপনি দেখেছেন?

না। গানটা শুনেছি। একবার দুবার না। অনেকবার।

কে গেয়েছে জানেন?

জানি। সুজাতা চক্রবর্তী।

হ্যাঁ। ওই একটাই বিখ্যাত গান তাঁর। অসাধারণ গেয়েছিলেন। কী সুন্দর গলা!

একটু থামল নীলু। তারপর বলল, বাংলাদেশেরও একজন বিখ্যাত লেখক জন্মেছেন ষোলঘরে। রাবেয়া খাতুন। তাঁর বড় ছেলে ফরিদুর রেজা সাগরও লেখক। তবে সাগরের বেশিরভাগ লেখাই ছোটদের জন্য। ভদ্রলোক চ্যানেল আইয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। চার পাঁচ বন্ধু মিলে বাংলাদেশে প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেল করলেন। সেটি এখন বিখ্যাত চ্যানেল আই।

খোকন শ্লেষের গলায় বলল, সর্বনাশ! আপনের তো দেখি অনেক জ্ঞান।

শুনে জয়িতা খিলখিল করে হেসে উঠল। লালুবাবুও হাসলেন। কিন্তু নীলু নির্বিকার। খোকনের দিকে আবার হাসিমুখে তাকাল। সত্যি বিক্রমপুরের ব্যাপারে আমার অনেক জ্ঞান। শুনুন ওই যে ডানপাশে সমষপুর কলেজ দেখছেন, এই কলেজ দেখে আমি বুঝতে পারছি এই গ্রামের নাম সমষপুর।

এইটা পোলাপানেও বুজতে পারব।

কিন্তু এই গ্রাম নিয়ে পোলাপানে যা বলতে না পারবে তা আমি বলতে পারব। শুনবেন?

না।

আরে ভাই রাগ করছেন কেন? শোনেন না। আপনি শিমুল বিল্লাহ কিংবা শিমুল ইউসুফের নাম শুনেছেন?

না শুনি নাই।

বলেন কী? বেইলি রোডে কখনও নাটক দেখতে যাননি?

না। মঞ্চনাটক আমার ভাল্লাগে না।

তাহলে আপনাকে আর এসব কথা বলে লাভ কী?

জয়িতা বলল, তবু আপনি বলুন। শুনি কী বলতে চাইছেন।

এই সমষপুর গ্রামের মেয়ে শিমুল বিল্লাহ। কিশোরী বয়সে রেডিও টিভি এবং সিনেমায় গান গেয়ে বিখ্যাত হন। তাঁর ওই সময়কার, এই ধরুন ষাটের দশকের শেষদিককার গান ‘ঝড় এলো, এলো ঝড়, আম পড়, আম পড়’ দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। তারপর তিনি নজরুলগীতি, আধুনিক, দেশাত্মবোধক এবং লালনগীতি গাইতে শুরু করলেন। কী যে সুন্দর গলা, বলে তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। যে ধরনের গানই তিনি গেয়েছেন, দুর্দান্ত গেয়েছেন। স্বাধীনতার পর বিয়ে করলেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফকে। তাঁর ডাকনাম বাচ্চু। আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে তিনি বাচ্চু ভাই বলে পরিচিত। বাচ্চু ভাই দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা, বিটিভিতে প্রডিউসার হিসেবে জয়েন করেছিলেন। সেলিম আল দীনের দারুণ জনপ্রিয় একটি ধারাবাহিক নাটক করেছিলেন আশি একাশি সালে। ‘ভাঙনের শব্দ শুনি’। হুমায়ূন ফরীদি সেরাজ তালুকদার চরিত্রটি করেছিলেন। যার কাজ শুধু পানি কেনা।

খোকন বিরক্ত গলায় বলল, এইসব ইতিহাস দিদিরে বইলা লাভ কী? সে কি আমগ দেশের এইসব লোকজনরে

চিনে?

জয়িতা সঙ্গে সঙ্গে বলল, না না আপনি বলুন। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে। এত বড় বড় মানুষ সম্বন্ধে জানচি, আমার খুব ভাল লাগজে।

নীলু জয়িতার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল। বাচ্চু ভাই শিমুল আর সেলিম আল দীন সম্বন্ধে বলতে বলতে আমি কিন্তু কলকাতায় চলে যাবো।

মুখের মিষ্টি একটা ভঙ্গি করল জয়িতা। মানে?

এই তিনজন কলকাতায়ও খুব বিখ্যাত।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, শাঁওলি মিত্র, কলকাতার মঞ্চনাটকের অন্যান্য বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী, নাট্যকার, এই ধরুন মনোজ মিত্র, বাদল সরকার এরা বাচ্চু ভাই সেলিম ভাই আর শিমুল ভাবীর খুবই ভক্ত এবং বন্ধু। বছরে এক দুবার কলকাতায় নাটক করতে যায় ওরা। ওদের দলটির নাম 'ঢাকা থিয়েটার'।

শিমুল ভাবী বললেন যে, তিনি কি আপনার আত্মীয়?

আরে না। অত বড় মানুষ আমার মতো হেজিপেজির আত্মীয় হবেন কেমন করে?

তবে যে ভাবী বলচেন?

কালচারাল ফিল্ডের সবাই নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুকে বাচ্চুভাই বলে, শিমুল ইউসুফকে শিমুল ভাবী বলে। আমিও সেই কারণেই বলছি।

তার মানে আপনিও কালচারাল ফিল্ডের লোক! ওই দেখুন, আমার অনুমানই ঠিক। আপনার কথাটথা শুনে প্রথমেই আমি সন্দেহ করেছিলুম হয় আপনি অভিনয় করেন, নয় আবৃত্তি। আপনার উচ্চারণ খুবই সুন্দর। চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ পর্যন্ত নিখুঁত। এবার পরিষ্কার করে বলুন দিকি আপনি কী করেন?

নীলু একটু ফাঁপড়ে পড়ল। কী বলবে ঠিক বুঝতে পারল না। তবে মুহূর্তেই ব্যাপারটা সামাল দিল। জয়িতার চোখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ একটা মুখভঙ্গি করল। আমি আসলে কালচারাল ফিল্ডের কেউ না। আপনি যা ভাবছেন আমি ওসবের ধারে কাছেও নেই। আমি নিতান্তই একটা হেজিপেজি ছেলে। চালচুলোহীন। করি না আসলে কিছুই। পরিষ্কার বা অপরিষ্কার কোনওভাবে বলার মতোই কিছু করি না।

জয়িতাও তাকিয়ে ছিল নীলুর চোখের দিকে। এভাবে বেশিক্ষণ কারও চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। লজ্জা করে। জয়িতারও করছিল। চোখ সে ফেরাতে চাইছিল, পারছিল না। কী এক আকর্ষণে যেন আটকা পড়ে গেছে তার চোখ। আর শরীরে একেবারে অচেনা এক অনুভূতি। শিরায় শিরায় আশ্চর্য এক কাঁপন। রক্ত যেন একটু দ্রুত বইছে। হৃদয়ে নতুন ধরনের তোলপাড় চলছে। জয়িতার তেইশ চব্বিশ বছরের জীবনে আজকের আগে এই ধরনের অনুভূতি কখনও হয়নি।

নীলু বলল, এবার কি পর্বটা শেষ করব?

কথাটা বুঝতে পারল না জয়িতা। অবাক চোখে পলক ফেলল। পর্ব মানে? কিসের পর্ব?

ওই যে বাচ্চুভাই, সেলিম ভাই, শিমুল ভাবী। তিন মহারানীর পর্ব।

জয়িতা মিষ্টি করে হাসল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।

নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু হচ্ছেন জীবন্ত কিংবদন্তী, সেলিম আল দীন হচ্ছেন আধুনিক বাংলা নাটকের অহংকার আর শিমুল ইউসুফ হচ্ছেন মঞ্চকুসুম।

মঞ্চকুসুম কথাটার অর্থ কী?

মঞ্চ মানে যেটা মঞ্চ আর কুসুম মানে ফুল।

কুসুম মানে যে ফুল তা তো বুজলুম। মঞ্চকুসুম মানে মঞ্চের ফুল, তাও বুজলুম।

নীলু কিছু একটা বলতে গেল তার আগেই জয়িতা বলল, আমি বুজেচি। শিমুল ইউসুফ অতি ভাল সঙ্গীতশিল্পী বলে, গানে গানে মঞ্চ মাতিয়ে দিতে পারেন বলে তাঁকে আপনারা মঞ্চকুসুম বলচেন। অর্থাৎ মঞ্চে গান গাইতে গেলে তিনি ফুলের মতো ফুটে ওঠেন।

জয়িতার ব্যাখ্যাটা ভাল লাগল নীলুর। নিজের মতো করে চমৎকার একটা মূল্যায়ন করেছে শিমুল ইউসুফের। যদিও ব্যাপারটা তেমন না। আসল ব্যাখ্যা নীলু করবে। তার আগে মাইক্রোবাসের অবস্থাটা বুঝে নেয়া দরকার। তারা দুজন সমানে বকর বকর করে যাচ্ছে, অন্যান্যদের অবস্থা কী দেখার জন্য প্রথমে খোকনের দিকে তাকাল নীলু। তাকিয়ে অবাক হলো। যাব্বাবা! মাল তো দেখি ঘুমে একেবারে গোবর হয়ে গেছে। কল্লাকাটা মুরগির মতো মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকে। নাকে ফোঁসফোঁস, ফোঁসফোঁস শব্দ। কোন ফাঁকে ঘুমে এভাবে তলিয়ে গেল সে!

তবে খোকনকে ঘুমাতে দেখে স্বস্তি পেল নীলু। ভালই হয়েছে। লোকটা একটু মান্দারকাঁটা টাইপের। যখন তখন খোঁচায়। মাওয়া পর্যন্ত যদি এই ঘুমটা তার আর না ভাঙে তাহলেই কাজটা হয়ে যাবে নীলুর। ঘটি মেয়েটাকে বাংলাদেশের আর্ট কালচার বিষয়ে পুরো জ্ঞান দিয়ে ছেড়ে দেয়া যাবে। যা এখন করে খা গিয়ে।

লালুবাবু উদাস হয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। চোখমুখের ভঙ্গি এমন, তাকিয়ে আছেন ঠিকই কিছুই দেখছেন বলে মনে হচ্ছে না। যেন তাকিয়ে আছেন প্রকৃতির দিকে আর দেখছেন নিজের মনের ভেতরটা। বহুকাল পেছনে ফেলে আসা একটা জীবনের ছবি যেন একটার পর একটা ফুটে উঠেছে মনের পর্দায়। তার মানে মাইক্রোবাসে থেকেও মাইক্রোবাসে তিনি আসলে নেই।

এটাও ভাল। আত্মমগ্ন আর গভীর ঘুম প্রায় একই ব্যাপার। অর্থাৎ লালুবাবু আর খোকন দুজনেই এই জগতে নেই। পাশাপাশি বসে দুজনেই চলে গেছেন অন্য জগতে। একজন ঘুমে আরেকজন স্মৃতিতে।

তাহলে বাকি রইল মাত্র একজন। বেলাল ড্রাইভার।

তার অবস্থা কী?

সে কি ঘুমে না স্মৃতিতে!

সর্বনাশ! দুটোর যে কোনওটা হলেই হয়েছে! নিঃশব্দে গাড়িটা গড়িয়ে পড়বে হাইওয়ের যে কোনও একপাশের জলায়, কিছু বুঝে ওঠার আগেই সলিল সমাধি হয়ে যাবে পাঁচজন মানুষের। খোকন ঘুমঘোরে পৌঁছে যাবে আসল জগতে, লালুবাবুর মনে হবে মৃত্যুও বুঝি পেছনে ফেলে আসা মায়াবী এক স্মৃতি, বেলাল ড্রাইভার ঝুলতে থাকবে ঘুমস্মৃতি আর মৃত্যুর মাঝখানে। ঠিক বুঝতেই পারবে না জলে ডুবে মৃত্যুর অভিজ্ঞতাটা কী! বাকি রইল নীলু আর জয়িতা। এই দুটো টগবগে তরুণপ্রাণের কী হবে? জীবন তো এখনও শুরুই হলো না। এখনও আসল কাজগুলোই বাকি রয়ে গেছে। যেমন বিয়েশাদি ঘরসংসার দুতিনটা ওঁয়্যাও ওঁয়্যাও। একটার একটু পেটখারাপ হলে সেটাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটা। বউ হয়তো প্যামপারস পরাতে ভুলে গেছে। দেখা গেল, ডাক্তারের কাছে যেতে যেতে বাপের কোলেই হেগে দিল। পাতলা গুয়ে মাখামাখি হয়ে গেল কোলের কাছের শার্ট প্যান্ট। পেটখারাপ করা গুয়ের গন্ধ মারাত্মক। সেই গন্ধে দিশেহারা হয়ে গেছে নীলু।

এই অব্দি ভেবে নাকমুখ কুঁচকে গেল নীলুর। ধুৎ কী সব গুমুত নিয়ে ভাবছে। তারচে' রোমান্টিক কিছু ভাবলে হয় না। যেমন ফুটফুটে একটা প্রেমিকা, বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে প্রেম করে, অনেক আদর সোহাগ, মান অভিমান কান্নাকাটি বিরহ শেষ করে বিয়ে করে ফেলা। প্রেমিকাটি একটু কঠিন টাইপের। বিয়ের আগে চুমু আর বুকে হাতটাত পর্যন্ত এলাউ করেছে, আসল কাজে কিছুতেই রাজি হয়নি। বাসররাত পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছে। বাসররাতে শুরু হয়ে গেল ফাটাফাটি কারবার।

ইস ওরকম একটা কারবার না করেই মরে যেতে হবে! কেউ কেউ বলেন লাভমেকিং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আনন্দ। মানে ওই আসল ব্যাপারটাকেই ভদ্রভাবে বলা, লাভমেকিং, শুনতে ভাল লাগে। শ্রেষ্ঠতম বিনোদন নাকি ওটা।

কেউ কেউ আবার সেক্সকে বলেন এক্সপ্রেশান অব লাভ। ভালবাসার অভিব্যক্তি। সেই অভিব্যক্তি প্রকাশের আগেই বেলাল ড্রাইভারের কল্যাণে সলিল সমাধিতে চলে যেতে হবে!

না না, এ কিছুতেই হবে না। নীলুর মতো অবস্থা তো জয়িতারও। সে এখনও কুমারী মেয়ে। ওসব ফাটাফাটি কারবারে জড়ায়নি।

নাকি জড়িয়েছে? বিয়ে হয়নি ঠিকই কিন্তু স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে। আর ইন্ডিয়ান মেয়েরা নাকি আজকাল খুবই ফাস্ট। ইউরোপ আমেরিকার মেয়েদের মতো। বিয়েফিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। অনেকেই নাকি লিভ টুগেদার করে।

জয়িতা কি এখনও ভার্জিন?

আচমকা এই কথাটা মনে এলো নীলুর।

আস্তে করে জিজ্ঞেস করবে নাকি!

ছিঃ। নীলু হেসে ফেলল। তার হাসিটা খেয়াল করল জয়িতা। কী হলো? একা একা যে হাসছেন বড়ো ?

না এমনি।

এমনি এমনি কেউ হাসে?

আমি হাসি। আমার হাসিরোগ আছে।

হাসিরোগটা আবার কী?

বেলাল একটা বাস ওভারটেক করল। একটু বেপরোয়া ভাবেই করল। নীলু চমকে তার দিকে তাকাল। আস্তে বেলাল ভাই, আস্তে। মাওয়া না পৌঁছে আসল জায়গায় পৌঁছাবার কোনও দরকার আমাদের নেই।

নীলুর দিকে চোখ না ফিরিয়েই হাসল বেলাল। না না, কিচ্ছু হইব না। ডরায়েন না। আমারে আমার মতন চালাইতে দেন।

নীলু আবার জয়িতার দিকে মুখ ফেরাল। সুন্দর করে হাসল। আমার অনেক ঝামেলা আছে, বুঝলেন।

কী ঝামেলা বলুন তো!

মানসিক ঝামেলা আর কী?

বলেন কী? মাথায় গণ্ডগোল আছে?

না মানে। মাথায় গণ্ডগোল থাকলে হয় মাথা খারাপ, মনে থাকলে হয় মানসিক ভারসাম্যহীন। আমার ভারসাম্যে কিছু ঝামেলা আছে। আমি মনে মনে অনেক কিছু ভাবি। ভেবে কখনও কখনও হাসি, কখনও কখনও কাঁদি। মুখের নানা প্রকারের এক্সপ্রেশান দিই।

জয়িতা হাসল। বুজলুম, সবই বুজলুম। আপনি আসলে খুবই ঘোরেল জিনিচ। একটা কথা ছুধু আমাকে বলুন, হাসচিলেন কেন?

অপলক চোখে জয়িতার চোখের দিকে তাকাল নীলু। গম্ভীর গলায় বলল, পরে একদিন বলব।

জয়িতা তাকাল নীলুর চোখের দিকে। পরে আপনার সঙ্গে কি আর দেখা হবে?

জানি না।

একটু চুপ করে রইল নীলু। তারপর বলল, সময় শেষ হয়ে আসছে। মঞ্চকুসুম ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি। গানের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ এবং টেলিভিশন দুজায়গাতেই অভিনয় শুরু করেছিলেন শিমুল ইউসুফ। দুজায়গাতেই সমান দক্ষতায় এগুতে লাগলেন। সেলিম আল দীনের লেখা একটার পর একটা মঞ্চনাটকে অভিনয় করে দেশ

কাঁপিয়ে দিলেন। শকুন্তলা, কীর্ত্তনখোলা, হাতহদাই, বনপাংসুল। আরও কত বিখ্যাত নাটক। এই মুহূর্তে সবগুলোর নাম মনে করতে পারছি না। তবে সবগুলোই সেলিম আল দীনের লেখা, নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর ডিরেকশান। তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে সেলিম আল দীন উপাধি দিলেন মঞ্চকুসুম।

জয়িতা উচ্ছ্বসিত হলো। ও, তাই বলুন।

যে গ্রামটা আমরা পেরিয়ে এলাম, সমষপুর, ওটা শিমুল ইউসুফদের গ্রাম।

একটু থামল নীলু। এবার বাচ্চুভাই সম্পর্কে বলি। তিনি বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রডিউসার হিসেবে জয়েন করেছিলেন। আমি ঠিক জানি না, বোধহয় কারও সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে রেজিগনেশান দিলেন। কাজ শুরু করলেন মঞ্চে। দলের নাম ঢাকা থিয়েটার। টেলিভিশনের প্রায় সব সুপারস্টার তাঁর দলে। আসাদ পীযূষ আফজাল সুবর্ণা ফরীদি শমী কায়সার। এক সময় ছিলেন আল মনসুর, নূপুর। সেলিম আল দীনের প্রায় সবনাটকের ডিরেক্টার তিনি। দারুণ সংগঠক। কালচারাল ফিল্ডে তাঁর ভূমিকা পিতার মতো। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়নি বাচ্চুভাইকে ছাড়া।

হঠাৎ এ সময় কথা বললেন লালুবাবু। ও খোকন, আসলাম কই? এই গেরামের নাম কী?

লটরপটর করা মাথাটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোজা করল খোকন। একহাতে চোখ ডলে বাইরে তাকাল। আইসা পড়ছি। এই গেরামের নাম মেদিন মোণ্ডল। ওই ডাইনদিকে খানবাড়ি।

তার কথা কেড়ে নিয়ে নীলু উত্তেজিত গলায় বলল, তাই নাকি? এটাই মেদিনী মণ্ডল? ইমদাদুল হক মিলনের গ্রাম। মানে মিলনের নানাবাড়ি। এই গ্রামে তাঁর ছেলেবেলার কিছুদিন কেটেছে।

খোকন বলল, হ। জানেন তো দেখি সবঐ। আর ওই যে খানবাড়ি দেখাইলাম...

জানি, ওটা হচ্ছে আতিকুল্লাহ খান মাসুদদের বাড়ি। জনকণ্ঠ পত্রিকার মালিক। তাঁর বড়ভাই হামিদুল্লাহ খান ছিলেন উয়িং কমান্ডার, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার, এই এলাকার এমপি!

খোকন বেশ বিরক্ত হলো। বোজলাম ভাই, আপনের বহুত জ্ঞান। এইবার থামেন। আর অল্প একটু রাস্তা আছে, শান্তিতে যাইতে দেন। খালি ভেকর ভেকর, ভেকর ভেকর। কার বাড়ি কোনহানে আপনের এত জাননের কাম কী!

নীলু থমথমে গলায় বলল, খোকন ভাই, আপনি শুরু থেকেই আমার সঙ্গে খুব মিসবিহেভ করছেন। ব্যাপারটা আমি সহ্য করেছি অন্য কারণে। কিন্তু এখন আর সহ্য করব না। আমি আমার আসল চেহারাটা এখন দেখাব। ফিলিং স্টেশানের স্টাফরা ঠিকই সন্দেহ করেছিল। আমি আসলে ওই জিনিস।

খোকন থতমত খেল। ওই জিনিস মানি?

বোঝেননি?

না।

সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারী, মাস্তান। হিন্দিতে বলে আতঙ্কবাদী। আমার বডিসার্চ না করে ভুল করেছেন আপনারা। আমার সঙ্গে মারাত্মক একটা আগ্নেয়াস্ত্র আছে।

নীলুর কথা শুনে মুখ শুকিয়ে গেল জয়িতার, লালুবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন আর খোকন দিশেহারা হলো। ঢোক গিলে বলল, কন কী ভাই!

ঠিকই বলছি। এখনই আমি আমার আসল কাজটা করব। এই ড্রাইভার গাড়ি থামাও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল বেলাল। হতভম্বের মতো নীলুর দিকে তাকিয়ে রইল।

জয়িতার মনের ভেতর তখন দারুণ তোলপাড় চলছে। বলে কী! নীলু তাহলে ওই! এত সুন্দর চেহারার যুবক,

এত সুন্দর করে কথা বলে, এত জানে আর সে কী না... । ছি ছি, এরকম এক যুবকের দিকে ওভাবে তাকিয়েছে সে, হৃদয়ে অচেনা অনুভূতি হয়েছে এরকম একজনের জন্যে। শিরায় শিরায় বয়ে যাওয়া রক্ত চঞ্চল হয়েছে যার জন্য সে তাহলে এক নষ্ট যুবক!

প্রথমে বেলালের দিকে তাকাল নীলু। তার মুখ শক্ত হয়ে আছে। চোখে পলক পড়ছে না। স্টিয়ারিং ধরে যেন পাথর হয়ে আছে বেলাল।

নীলু তাকাল খোকনের দিকে। দুহাত অবিরাম মুঠো করছে সে। কী করবে বুঝতে পারছে না। ঘন ঘন মাথা নাড়ছে, ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে।

লালুবাবু আধশোয়া হয়েছিলেন, কখন সোজা হয়ে বসেছেন নীলু টের পায়নি। মুখচোখে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তাঁর। নীলু তাঁর দিকে তাকাতেই একহাতে জয়িতার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন লালুবাবু।

নীলু কঠিন মুখে জয়িতার দিকে তাকাল। আঙুল তুলে বলল,

আমি শুধু সামরিক আদেশ অমান্য করে হয়ে গেছি

কোমল বিদ্রোহী, প্রকাশ্যে ফিরছি ঘরে,

অথচ আমার সঙ্গে হৃদয়ের মতো মারাত্মক

একটি আগ্নেয়াস্ত্র... ...

তারপরই ঠা ঠা করে হেসে উঠল। আমার সঙ্গে আছে হৃদয়ের মতো মারাত্মক একটা আগ্নেয়াস্ত্র। এই অস্ত্র কাউকে দেখানো যায় না, বডিসার্চ করে এই অস্ত্রের হদিস পাওয়া যায় না। লিফট দেয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি আমার হৃদয়াস্ত্র নিয়ে নেমে যাচ্ছি। খোদা হাফেজ এবং নমস্কার।

নীলু আর কোনওদিকে তাকাল না, দরজা খুলে রাস্তায় নেমে গেল। মাইক্রোবাসে তখন দারুণ স্বস্তিকর পরিবেশ। বেলাল একমুহূর্তও দেরি করল না, গাড়ি চালিয়ে দিল। লালুবাবু খোকনের দিকে তাকালেন। ভাল পাগলের পাল্লায় পড়ছিলাম।

খোকনও হাসল। হ। পয়লা ভাবছিলাম আধা পাগল, পরে দেখি পুরা পাগল।

শুধু জয়িতা কোনও কথা বলল না। তার মনটা খুব খারাপ হয়েছে। নীলু কেন এমন করল? এত নাটক করে নেমে যাওয়ার কী দরকার ছিল! নামতে হয় বলে কয়ে সুন্দরভাবে নামবে। বিদায় নিতে হয় সুন্দরভাবে নেবে। এই কী!

কিন্তু নীলুর সঙ্গে কি আর কখনও তার দেখা হবে!

জয়িতার ইচ্ছে হলো মুখ ফিরিয়ে মাইক্রোবাসের পেছনের গ্লাস দিয়ে দেখে নীলুকে দেখা যায় কিনা! নীলু কী করছে, দাঁড়িয়ে আছে না হাঁটছে!

ওভাবে তাকালে দাদু কী ভাববেন, খোকন দা কী ভাববেন!

লজ্জায় নিজের মনকে কঠিনভাবে শাসন করল জয়িতা। পেছন ফিরে তাকাল না।

সীতারামপুরের দিকে চলে যাওয়া রাস্তার মুখে কয়েকটা দোকানপাট। একটা চায়ের দোকানও আছে। দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে দুজন রাজনীতিঅলা আওয়ামী লীগ বিএনপি চালিয়ে যাচ্ছে। দুজনের হাতেই চায়ের কাপ। কথার তালে চায়ে চুমুক দিতে ভুলে যাচ্ছে। যেন চায়ে চুমুক দেয়ার ফাঁকে একজন আরেকজনকে কুপোকাত করে ফেলবে, জিতে যাবে। সেই সুযোগ কি দেয়া যায়, নাকি দেয়া ঠিক হবে!

দোকানদার লোকটা পড়েছে মহা ফাপড়ে। না আওয়ামী লীগ সাপোর্ট করতে পারছে, না বিএনপি। দুজনেই

তার খরিদ্দার, কাকে রেখে কার পক্ষ নেবে। এজন্য অযথা হাসি হাসি মুখ করে একবার আওয়ামী লীগের দিকে তাকাচ্ছে আরেকবার বিএনপির দিকে। আর মনে মনে সমানে গালাগাল করছে।

চায়ের দোকানের পাশেই একটা মুদি দোকান। সেই দোকানে কোনও খরিদ্দার নেই। নূরানী চেহারার একটা লোক বসে আছে ক্যাশবাক্সের সামনে। পরনে টেটরনের সাদা পাঞ্জাবী, সাদা লুঙ্গি। মাথার বাবরি চুল ধবধবে সাদা। দাড়ি যতদূর লম্বা হওয়া সম্ভব হয়েছে। দাড়ির রংও মাথার চুলের মতোই। বিকেলের বিষণ্ন আলোয় কোনদিকে যে তাকিয়ে আছে তা বোঝা যায় না। হাতে সিগ্রেট জ্বলছে। নীলু তার দিকে তাকাতেই আনমনা ভঙ্গিতে সিগ্রেটে টান দিল, কিন্তু নীলুকে খেয়াল করল না।

লোকটির সবকিছুই সাদা বলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ একটা ভাব এসেছে। কিন্তু এরকম চেহারার লোকেরাও সিগ্রেট খায় নাকি! রবীন্দ্রনাথ কি সিগ্রেট খেতেন? পান বিড়ি চা বা অন্যকোনও নেশা কি রবীন্দ্রনাথের ছিল? চরস গাঁজা, ভাঙ আফিম! রফিক আজাদের ভাষায় স্কটল্যান্ডের সোনালি শিশির, অর্থাৎ হুইস্কি কিংবা ওয়াইন, রবীন্দ্রনাথ কি এসব কখনও ট্রাই করেছেন! কই শোনেনি তো নীলু! কোথাও পড়েওনি। অন্যরকমের একটা নেশা রবীন্দ্রনাথের ছিল, প্ল্যানচ্যাট করা। মাঝে মাঝে প্ল্যানচ্যাট করতেন তিনি, বিখ্যাত আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। এই নিয়ে একটা বইও লেখা হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা'। বেশ মজার বই।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তেমন কোনও খারাপ কথা কখনও শোনেনি নীলু। শুধু একটুখানি একটা শুনেছিল। কেতকী কুশারি ডাইসন একটা বই লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে'। আর্জেন্টিনার মেয়ে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল। তাঁকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছিলেন,

'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী

তুমি থাকো সিন্ধুপারে'।

আর্জেন্টিনার বুয়েনেস আয়ার্সে ওকাম্পোর সান্নিধ্যে কিছুদিন ছিলেন কবি। এই নিয়ে শঙ্খঘোষ সুন্দর একটি বই লিখেছিলেন 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'। সেই বইটি নীলু পড়েছে। কিন্তু কেতকীর বইটা পড়া হয়নি। বহু গবেষণা করে বইটা তিনি লিখেছেন। ওই বইয়ের কোথায় নাকি লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ একদিন উদাস ভঙ্গিতে ওকাম্পোর স্তন ছুঁয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু এইটুকুই।

এ এমন কী অন্যায় কাজ? কী খারাপ কাজ?

তবে মুদি দোকানের রবীন্দ্রনাথটির হাতে সিগ্রেট দেখে নীলুর খুব সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করল। কত আগে একটা সিগ্রেট খেয়েছে। সেই যে তালুকদার ফিলিং স্টেশানের শেডের তলায় বসে।

আরে না, তখনও তো সিগ্রেট খাওয়া হয়নি। সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করছিল, চা খেতে ইচ্ছে করছিল। ওই ইচ্ছে পর্যন্তই, খাওয়া হয়নি। পরিবেশটা এমন স্নিগ্ধ ছিল, চা সিগ্রেট খাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল নীলু। গান গাইতে শুরু করেছিল, 'আমায় থাকতে দে না, আপন মনে'।

তারপর কি সিগ্রেট একটা খেয়েছিল নীলু, নাকি? মাইক্রোবাসে বসে?

ধুৎ মনে নেই। দুপুরের পর থেকে এমনসব নাটকীয় ঘটনা ঘটতে শুরু করল। সবকিছুর মূলে ওই টয়লেটে যাওয়া। আল্লাহ যে মানুষের শরীরটা এমনভাবে কেন তৈরি করেছেন! একদিক দিয়ে গ্রহণ আরেকদিক দিয়ে বর্জন। যে যত ভালভাবে এই গ্রহণ বর্জনের কাজটা চালিয়ে যেতে পারবে সে তত সুখী মানুষ। এই অর্থে নীলু আজ সুখে ছিল না। তার একটু অনিয়ম হয়ে গেছে। যাকগে এই অনিয়মের ফলে অভিজ্ঞতাটা মন্দ হচ্ছে না। ঘটি মেয়েটা তো ভালই ছিল। তবে ওই খোকন লোকটা মহা খাতারনাক। ওর কারণেই শেষ পর্যন্ত জম্পেশ একটা নাটক নীলুকে করতে হলো।

সবকিছু মিলিয়ে আজ মনে হচ্ছে নাটকেরই দিন। এই যে মুদি দোকানে একটা রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন একে দেখেও তো নাটক করতে ইচ্ছে করছে নীলুর। এ্যাকটিং করে ফাটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

বেশ একটা ভাব নিয়ে নীলু এসে মুদি দোকানটার সামনে দাঁড়াল। বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে বলল, আপনার পা দুখানা দিন গুরুদেব।

মুহূর্তে উদাসীনতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল লোকটির। ভ্যাবাচ্যাকা খেল। কী কইলেন?

না, খারাপ কিছু বলিনি। আপনার পা দুখানা চেয়েছি।

পাও চাইছেন?

জ্বি।

ক্যান? আমার পাও দিয়া আপনে কী করবেন? নিজের পাও আমি আপনেরে দিমু কেমতে? কাইট্টা দিমুনি?

নীলু অমায়িক হাসল। আরে না গুরুদেব। আপনি আমার কথার অর্থটা বোঝেননি। আমি আপনার পা কেটে নিতে চাইছি না। আপনার পা দুটো একটু ছোঁব। অর্থাৎ কদমবুসি করব।

লোকটিও এবার হাসল। বুজছি বুজছি, সেলাম করবেন। আইজ কাইল অনেকেই আমারে পায়ে হাত দিয়া সেলাম করে। নেন, আপনেও করেন।

বসে থেকেই পা দুখানা লম্বা করে এগিয়ে দিল লোকটি। নীলু মনে মনে প্রমাদ গুনল। মাল তো দেখি হেব্বি চাল্লু! না, এই জিনিসের পায়ে হাত দেয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের মতো চেহারা ধরার রহস্যটা উদঘাটন করতে হবে।

বাড়িয়ে দেয়া হাত দুখানা গুটিয়ে নিল নীলু। না না গুরুদেব আপনার পায়ে হাত দেয়া ঠিক হবে না। একদম ঠিক হবে না।

লোকটি বলল, ক্যা?

আপনার এত পবিত্র পা আমার এই নোংরা হাতে ছোঁয়া অন্যায় হবে। ঘোরতর অন্যায়।

নোংরা হাত অর্থ কী? পায়খানা কইরা আইছেননি?

নীলু লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

লোকটি তার পা দুখানা টেনে নিয়ে বলল, সাপান দিয়া হাত ধুইতে পারেন নাই?

না, চান্স পাইনি।

বুজছি, বেটাইমে ধরছিল। আজাগা কুজাগায় সারছেন। তয় বাজান, মাইনষের শইলতো, এমুন হইতেই পারে। এইটা কিছু না। সাপানের কামডা আপনে মাটি দিয়াও সারতে পারতেন। মাটিতে হাত ঘইষ্যা ভাল মতন ধুইয়া ফালাইলেই হইত। মাটিই হইতাছে খাটি, মাটিই হইতাছে আসল জিনিস। মাটির উপরে কোনও জিনিস নাই। আমাগ এই দেহ মাটির, আমরা যা খাইয়া বাইচা থাকি তা তৈয়ার হয় মাটি থিকা, মরণের পর মাটির দেহ আমগ চইলাও যায় মাটির তলে। তয়, কন বাজান মাটির থিকা খাটি আর কিছু আছে!

নীলু বুঝে গেল লোকটি মারফতি লাইনের। দেশগ্রামে এরকম লোক দুচারজন থাকেই। তবে মারফতি লাইনে আজকাল মনে হয় সুবিধা নেই। পেট চলে না। লোকটি এজন্য মুদি দোকান দিয়ে বসেছে।

নীলুর বেশ মজা লাগছিল। আজকের দিনটা সত্যি অসাধারণ। তার দুটো প্রিয় সাবজেক্টের একটি রবীন্দ্রনাথ আর একটি বিক্রমপুর। আর আচমকা এভাবে বিক্রমপুরে এসে মেদিনী মণ্ডল গ্রামে সে পেয়ে গেল রবীন্দ্রনাথে মতো দেখতে একজন মুদি দোকানদার, যে কিনা মারফতি লাইনের লোক।

রবীন্দ্রনাথও কি মারফতি লাইনের লোক ছিলেন না? নয়তো কেন লিখেছিলেন 'আপনাকে এই চেনা আমার ফুরাবে না'।

নীলু বলল, বেয়াদবি মাফ করবেন গুরুদেব। আমি একটু নালায়েক টাইপের। আপনার নামটা জানি না।

আমার নাম বাজান সেন্টু। সেন্টু মস্তান।

আপনার ব্রান্ড কী?

জ্বে?

না মানে যে বস্তুটা সেবন করছেন, অর্থাৎ কী সিগ্রেট খাচ্ছেন?

ও, এইটা হইল বাজান ইস্টার সিকারেট। খাইবেন?

জ্বি।

সেন্টু মস্তান ক্যাশবাক্সের একপাশে রাখা প্যাকেট খুলে একটা সিগ্রেট এগিয়ে দিল। নীলু বিনীত ভঙ্গিতে সিগ্রেটটা নিল।

এই দোকানটির সামনেও চায়ের দোকানের কায়দায় একটা কাঠের বেঞ্চ পাতা। একপাশে টিনের বেড়ার সঙ্গে ঝুলছে একটা দড়ি। দড়ির মাথাটা জ্বলছে। বিড়ি সিগ্রেট ধরাবার ব্যবস্থা। নীলু সেই দড়িতে সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, এখানে একটু বসব গুরুদেব?

জ্বে জ্বে। বসেন।

নীলু বসল। সিগ্রেটে বড় করে একটা টান দিল। চারদিকে জানুয়ারি মাসের কুয়াশাজড়ানো বিকেল। চায়ের দোকানে এখনও সেই দুজন একই কায়দায় রাজনীতি করছে। নীলু ভুলে গেল জয়িতাদের সঙ্গে নিতান্তই মজা করার জন্য এখানটায় সে নেমে পড়েছে। তার যাওয়ার কথা মাওয়ার ইলিশ কাউন্টারে। যদি ব্যাগটা পাওয়া যায়। এখন সে কথা তার মনেই পড়ছে না। সেন্টু মস্তানের মুখোমুখি বসে স্টার সিগ্রেট টানতে টানতে সে যেন অন্য জগতের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। সেন্টু মস্তান নামের লোকটিকে তার আবিষ্কার করতে ইচ্ছে করছে। কেন এমন রবীন্দ্রনাথের মতো চেহারা ধরেছে সে। কী তার জীবন বৃত্তান্ত, কী তার জীবন দর্শন!

এত সস্তা সিগ্রেট নীলু অনেকদিন খায়নি। গলায় বেশ লাগছিল, টানে টানে মাথাটাও কেমন টালমাটাল হয়ে যাচ্ছিল। তবু অদ্ভুত এক আনন্দ হচ্ছে। এই সিগ্রেটের সঙ্গে এককাপ চা হলে আরও জমবে।

নীলু বলল, চা সেবন করা যাবে গুরুদেব?

সেন্টু মস্তানের স্বর একটু বদলাল। হ যাইবো না ক্যান, যাইবো। তয় তার আগে আপনেরে বাজান একখান কথা কই, আমার তরিকাটা মনে হয় আপনে ধরতে পারেন নাই। নাম শুইনা আপনে মনে হয় আমারে হিন্দু মনে করছেন। সেন্টু হিন্দুগ নাম। তয় আমি হিন্দু না। মোসলমান। বিক্রমপুর একসমায় হিন্দুগ জাগা আছিল দেইখা এহেনকার অনেক মোসলমানের নামঐ হিন্দুগ লাহান। আমার বাপের নাম আছিল হাফেজ...

তার আগে গুরুদেব চায়ের কথাটা বলেন। সেবন করতে করতে আপনার তরিকাটা বোঝার চেষ্টা করব।

সেন্টু মস্তান বেশ একটা হাঁক দিল। জনাবালি, দুই কাপ চা দে। ফাসকেলাশ কইরা দিস।

সেন্টুর হাঁকে চায়ের দোকানের রাজনীতি মুহূর্তের জন্য বন্ধ হলো। ফাপড়ে পড়ে থাকা দোকানদার জনাব আলী দুকাপ চা বানাবার কাজ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল।

সেন্টু বলল, তয় যেইডা কইতেছিলাম, মন দিয়া শোনেন। হাফেজ হইল মোসলমানের নাম। কোনও হিন্দুর নাম হাফেজ হয় না। তয় হাফেজ সাবে তার বেবাক পোলাপানের নাম রাখল হিন্দুগ নাম। ছানা সেন্টু মিন্টু মাখন কমল বিমল। মিন্টু আছিল আমার ছোড। বহুত দিন আগে ঢাকায় থাকতো, গাউছিয়া মার্কেটের নিচের তালার এক জুতার দোকানে কাম করতো। কী এক অসুখে পঙ্গু হইয়া গেল। বুজলেন বাজান, তারবাদে দেশে আইয়া পড়ছিল। বউ পোলাপান লইয়া বড় কষ্টের জীবন। বর্ষাকালে সীতারামপুরের চকে গেছিল শাপলা উডাইতে। ছোট্ট একখান কোষা নাও লইয়া গেছে। আতুর লুলা মানুষ। উপুর হইয়া শাপলা টান দিতে গিয়া পানিতে পইড়া গেল। ছোডকালে খুব ভাল সাতর জানতো। আর দেখতে যা সোন্দর আছিল না। পঙ্গু হইয়া যাওনে সাতর দিতে পারল না। পানিতে ডুইব্বা মইরা গেল। দুই দিন পর মিন্টুর লাশ পাওয়া গেছে।

জনাব আলী দুহাতে দুকাপ চা নিয়ে এলো। নীলুর হাতে প্রথম কাপটা দিতেই বিনীত ভঙ্গিতে নীলু সেই কাপ সেন্টুর হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর নিজের কাপে চুমুক দিয়ে দেখে সেন্টু সেই আগের মতো উদাস হয়ে আছে। ভাইয়ের মৃত্যুর কথা বলতে বলতে চেহারা দুঃখী হয়ে গেছে।

নীলু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, চাটা সেবন করুন গুরুদেব। সেবন করতে করতে বলুন।

সেন্টু চায়ে চুমুক দিল। কইতে চাইলাম কী, কইয়া ফালাইলাম কী? বাজান, তার আগে আসল কথাটা আপনের কাছ থিকা জানন উচিত। আপনে কে? কোন গেরামের পোলা?

মিথ্যে কথা নীলু অনায়াসে বলতে পারে। মিথ্যে বলাটাকে সে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। এখন সেই ক্ষমতাটা কাজে লাগাল। আমি গুরুদেব আপনার এলাকারই সন্তান। আমাদের বাড়ি হচ্ছে কুমারভোগ কিন্তু এলাকায় আমার কখনও আসা হয়নি। আমার বাবা ছিলেন কাজির পাগলা হাইস্কুলের ছাত্র। তবে দেশের সঙ্গে তিনিও কোনও যোগাযোগ রাখেননি। কাজির পাগলা থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকা পলিটেকনিকে পড়াশুনা করেছেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। এখন সিটি করপোরেশনের ওভারসিয়ার। তবে ভদ্রলোক কিছুদিন ধরে অসুস্থ। সাতটা ব্লক ছিল হার্টে। বেঙ্গালোরে গিয়ে বাইপাস করিয়েছেন। যে ডাক্তার কাজটা করেছেন তার নাম শেটি। ইন্ডিয়ানরা শেটিকে ভগবান মনে করে। এ পর্যন্ত আট হাজার হার্টের অপারেশন করেছেন। একজনও মারা যায়নি। এরকম লোককে ভগবান বলবে না তো কী বলবে বলুন গুরুদেব!

সেন্টু মুখ কালো করল। এই ভগবান কথাটা থিকাই আসল কথায় আসি। এই যে আপনে আমারে গুরুদেব বলতাছেন এইটা আমার নাপছন্দ বাজান। এইসব গুরুদেব মুরুদেব কয় হিন্দুরা। মোসলমানরা গুরুরে কয় ওস্তাদ আর নাইলে হুজুর। আর ওই যে সেবন না কী জানি কথাডা কইলেন ওইটা হইল গাজাখোরগ কথা। গাজা খাওনরে অরা খাওন কয় না কয় সেবন, সেবন করা। আমি বাজান হিন্দুও না, গাজাখোরও না। আমার লগে বাজান এইহগল কইয়েন না।

জ্বি আচ্ছা।

এইবার আপনের বাপের কথা কন। কী জানি কইতে চাইতাছিলেন।

নীলু চায়ে চুমুক দিল। এর মধ্যে বেশ কয়েক চুমুক চা সে খেয়েছে। কিন্তু এই প্রথম মুখ বিকৃত করল। তার আগে আর একটা কথা বলি গুরুদেব।

আবার গুরুদেব?

নীলু হাসল। এটা বলার কারণ আছে। আপনি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন?

কন কী বাজান, তার নাম কে না শুনছে। ছোডকালে আমি তার কবিতাও পড়ছি। ওই যে ‘আমাদের ছোটনদী চলে বাকে বাকে’।

রবীন্দ্রনাথকে তার শিষ্যরা গুরুদেব বলতো। আপনার চেহারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চেহারার খুব মিল। এজন্য আপনাকে আমি গুরুদেবই ডাকবো। এখানে হিন্দু মুসলমান কোনও সমস্যা না। গুরুদেব, আপনার বাড়ি কোন গ্রামে?

এই গেরামেই বাজান। মেদিনী মণ্ডল।

তাহলে আপনি হচ্ছেন গিয়ে মেদিনী মণ্ডলের রবীন্দ্রনাথ।

সেন্টু হাসল। আপনে বাজান তুখ্‌খাড় (তুখোড়) পোলা। কন, আপনের যা মন চায় কন।

আগে চায়ের কথা বলি, তারপর বাবার কথা।

কন, কন।

এই চাটা গুরুদেব খুব খারাপ। এত পচা চা আমি জীবনে খাইনি। এই চায়ের তুলনা মাদি ছাগলের...

বুজছি, বরকির মুতের লাহান।

জ্বি। একদম ওরকম। তবে ঠেকায় পড়লে ওই জিনিস খেতেও মন্দ লাগে না।

একচুমুকে চা শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখল নীলু। বাবার কথা বলে এই চ্যাপ্টারটা শেষ করছি গুরুদেব। তাহলে আমার কথা শেষ। শুনবো শুধু আপনার কথা। অপারেশনের পর বাবা খুব দুর্বল হয়ে গেছেন। আমি তার একমাত্র ছেলে। আমার মধ্য দিয়ে নিজের সব স্বপ্ন আজকাল দেখছেন বাবা। নিজে যা না পারছেন আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন। একদা কাজির পাগলা হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। সেই স্কুলের শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল এই অনুষ্ঠানে আসার। হার্টের কারণে আসতে পারলেন না বলে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার আসার কথা ছিল কাল সকালে। কাল থেকেই তো প্রোগ্রাম। কিন্তু আমি একদিন আগেই চলে এলাম। এলাকাটা একটু ঘুরেটুরে দেখব। মাইক্রোবাস নিয়ে এসেছি। সঙ্গে আরও লোকজন আছে। মানে আমার এক নানা আর দূরসম্পর্কের এক বড়ভাই। বড়ভাইর নাম খোকন। আর একটা অন্যায় কাজও করে ফেলেছি। শুনলে আপনি হয়তো রাগ করবেন গুরুদেব।

নীলু লাজুক মুখ করল। আমি বিবাহ করে ফেলেছি।

সেন্টু অবাক হলো। রাগ করুম ক্যান বাজান! বিয়া করন তো ভাল। বশ্বের কালে বিয়া করতে হয়। এইটাই আল্লাহ পাকের বিধান।

জ্বি তা আমি জানি। তবে আপনার রাগ করার কারণ হলো আমি একটা হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছি। সে যেমন সুন্দর, তার নামটাও তেমন সুন্দর। জয়িতা। জয়িতাও আছে মাইক্রোবাসে। তারা কুমারভোগ চলে গেছে। আমি এখানে নেমেছি এলাকাটা ঘুরে দেখার জন্য। ঘুরেটুরে দেখে একটা রিকশা নিয়ে কুমারভোগ চলে যাব। তবে আমার যে কী সৌভাগ্য, এখানে না নামলে আপনাকে আমি কোথায় পেতাম বলুন তো গুরুদেব।

সেন্টু অপলক চোখে নীলুর দিকে তাকিয়েছিল। নীলু থামতেই মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বলল, পয়লা চিনতে পারি নাই। অহন আপনেরে আমি চিনছি।

সিগ্রেটে টান দিতে গিয়ে থতমত খেল নীলু। কী করে চিনলেন?

সেন্টু মস্তান হাসল। আমি মানুষ চড়াইয়া খাই বাজান। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না।

তাহলে বলুন তো আমি কে?

সেইটা পুরাপুরি কইতে পারুম না। তয় যেই পরিচয় আপনে আমারে দিলেন আর যেই হগল কথা কইলেন তার কোনওটাই সত্য না। এতক্ষণ ধইরা আপনে আমার লগে মিছাকথা কইছেন। ফাইজলামি করছেন।

আয়েশি ভঙ্গিতে সিগ্রেটে শেষ টানটা নীলু দিল, মনে মনে প্রমাদ গুনল। আশ্চর্য লোক তো! এত নিখুঁত ভঙ্গিতে বলার পরও নীলুর মিথ্যেটা সে ধরে ফেলেছে। সত্যি লোক চড়িয়ে খাওয়া লোক। নাকি এই জাতীয় লোককেই বলে বারো ঘাটের পানি খাওয়া লোক ? বিক্রমপুরের ভাষায় ঘাঘু লোক।

এই ঘাঘু লোকটাকে নীলু এখন ম্যানেজ করে কী করে? মিথ্যেটা যে ধরা পড়ে গেল!

সিগ্রেট পায়ের কাছে ফেলে কেডস পরা পায়ে ডলে ডলে নিভাল নীলু। গুরুদেব, আপনি আমার ওপর খুব অবিচার করলেন।

কীয়ের অবিচার?

এই যে আমাকে ভুল বুঝলেন। বললেন আমি আপনার সঙ্গে মিথ্যে বলছি। আমার চেহারা দেখে কি আপনার মনে হয় আপনার মতো একজন মানুষের সঙ্গে, মেদিনী মণ্ডলের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি মিথ্যে বলতে পারি ?

সেন্টু মস্তান হাতের সিগ্রেট ছুড়ে ফেলল। জ্বি পারেন। আপনে যে মিছাকথা কইতাছিলেন, ফাইজলামি করতাছিলেন হেইডা আমি বোজলাম কেমতে জানেন?

না।

সেন্টু মস্তান হাসল। এই যে না কইলেন। এই না থিকা আপনেই কইলাম সিকার করলেন আপনে আমার লগে মিছাকথা কইছেন।

নীলু মনে মনে বলল, বাপরে! এ তো দেখি কঠিন মাল!

সেন্টু মস্তান বলল, বাজান, সেরের ওপরে সোয়াসের বইলা একটা কথা আছে। দুনিয়ার বেবাক মানুষই নিজেরে সবথিকা চালাক মনে করে। বোজতে চায় না তার থিকাও চালাক মানুষ আল্লার দুইন্নাইতে আছে। একসেরের উপরের মাপটাই হইল সোয়াসের। আপনে যে আমার লগে ফাইজলামি করতাছেন এইডা আমি পয়লাই বুইজ্জা গেছিলাম। যহন কইলেন পাও দুইখান দেন তহনই বুজছিলাম আপনে একটা ফাজিল। তয় ফাইজলামিডা বাজান আমিও তারবাদে আপনের লগে করছি। বইসা থাইকাই পাও দুইডা আপনের মিহি আউাইয়া দিছি। দুনিয়াতে এমুন কোনও মানুষ আছেনি, যারে কেউ সেলাম করতে চাইলে বইয়া বইয়া পাও আউাইয়া দেয়! তয় আপনেও তুখ্খাড় পোলা, লগে লগেঐ বুইজ্জা গেছেন। এর লেইগা হাত সরাইয়া নিলেন, সেলাম করলেন না। হাগামুতার কথা কইলেন। ওইডাও আমি বুজলাম। আপনের হাত যে নোংরা না হেইডা পোলাপানেও বুজবো। হইতে পারে আপনে হাহা আইছেন, তয় ওই কাম সাইরা হাত পরিষ্কার কইরা না ধোওনের লাহান মানুষ আপনে না। যুদি সেইটা না করতেন তয় আপনের হাত থিকা গুয়ের গন্দ আইতো। আমার নাক খুব পরিষ্কার। এত দূর থিকাও আপনের হাতের গন্ধ আমি পাইতাম।

নীলু তখন হাঁ করে সেন্টু মস্তানের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুখে সিমত একখানা হাসি সেন্টু মস্তানের। গলার স্বরে কোনও তাপ উত্তাপ নেই। বেশ নির্বিকার এবং নিরীহ ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে। আরেকখান কথা আছে বাজান। ডাকের কথা। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। আপনের সবকিছুতেই অতিভক্তি আছিল। গুরুদেব, সেবন এইহগল কথাবার্তা থিকা আমি বুজছি। বাজান, পাখপাখালির মইধ্যে সবথিকা চালাক হইল কাউয়া। তয় কাউয়ায় কইলাম খুব খারাপ একখান জিনিস খায়। গু। আপনেরে কি আর কিছু কওনের দরকার আছে বাজান?

নীলু হাসিমুখে বলল, জ্বী আছে।

কী কমু কন?

আমার কোনও কথাই যেহেতু আপনি বিশ্বাস করেননি তাহলে বলুন তো আমি আসলে কে? কেন এখানে এসেছি?

আমি কইলাম কইতে পারুম।

বলেন।

বিক্রমপুরের পোলা আপনে হইলেও হইতে পারেন। এই পয়লা বিক্রমপুরে আইছেন এইডাও হইতে পারে। ক্যান আইছেন এইডা কইলাম আপনে নিজেই কইয়া দিছেন। আইছেন কাজির পাগলা স্কুলের লেইগা।

ঠিক, একদম ঠিক।

শোনেন বাজান, মানুষ ইচ্ছা করলে শতকরা একশোভাগ সত্যকথা কইতে পারে, শতকরা একশোভাগ মিছাকথা কইতে পারে না। একশোভাগ মিছাকথার মইধ্যে একভাগ আধভাগ হইলেও সত্যকথা থাকবো। যেমুন আপনের বেবাক মিছাকথার মইধ্যে কাজির পাগলা স্কুল কথাটা সত্য। স্কুলের অনুষ্ঠানের লেইগা বহুত কিসিমের মানুষ দ্যাশ গেরামে আইতাছে। আপনেও একটা কিসিম।

বেপারিবাড়ির দিক থেকে দশ বারো বছরের একটা মেয়ে হেঁটে আসছিল। পরনের ফ্রক দেখে বোঝা যায়

কাজের মেয়ে। নীলুর পাশ দিয়ে দোকানের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে। বাবা, একখান ম্যাচ দেন।

ম্যাচ দিয়ে পয়সা রাখল সেন্টু মস্তান। বলল, এই যে মাইয়াডা দেখলেন, অরা কইলাম বিক্রমপুরের মানুষ না। ফরিদপুইরা। চরের। বিক্রমপুর দ্যাশটা অহন অন্য দ্যাশের মাইনষে ভইরা গেছে। যেই মিহি চাইবেন হেই মিহিই খালি মানুষ। এত মানুষ বিক্রমপুরে কোনওদিন আছিল না। বিক্রমপুর আছিল নিটাল জাগা। হারাদিনে দশ বিশটা মানুষ দেখা যাইতো না। আর অহন কাউয়া চিলের লাহান মানুষ। ঢাকা মাওয়া রাস্তাডা হওনে এই কারবারটা হইছে। দ্যাশ গেরামের বেবাক বাড়িতে অহন অন্য দ্যাশের মানুষ। স্বাধীনতার পর বিক্রমপুরের মানুষ গেছে ধনী হইয়া। বেবাকতেই থাকে ঢাকার টাউনে। বাড়ি পাহারা দেয় চউরারা। বিক্রমপুরে অহন আসল বিক্রমপুইরা বিচরাইয়াই পাওয়া যায় না।

নীলু বলল, বুঝলাম। কিন্তু আমার কথাটা তো শেষ করলেন না।

কোন কথা?

আমি কে, সেটা।

ও। আমার মনে হয় আপনে বাজান সাংবাদিক। কাজির পাগলা স্কুলের ব্যাপারে আসছেন। পেপারে লেকবেন। আর নাইলে আপনে হইতাছেন পুলিশের লোক। আইবির লোক। সিআইডি। স্কুলের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মিনিস্টাররা আইবো হের লেইগা আগেই আপনেরা আইয়া বেবাক খোঁজখবর লইতাছেন। তয় বাজান দ্যাশটা আমগ খারাপ না। ইকটু পলিটিকস আছে, হেইডা বাজান কোন জাগায় না আছে। তয় মারামারি ধরাধরি এইহগল আইজকাইল আর নাই। একসমায় আছিল। কুরবান আলী সাব, শাহ মজ্জেম সাব তারা ইকটু, ওই আর কি। তাগো দুইজনের মইদ্যে একটু রেষারেষি আছিল। অহন কিছুই নাই।

নীলু হাসল। আপনাকে আর গুরুদেব বলছি না। আপনাকে মস্তান ভাই বলছি। তার আগে আমার নামটাও আপনি জেনে নিন, আমার নাম নীলু। আমি এখন যতদূর সম্ভব সত্যকথা আপনাকে বলব। আমি পুলিশের লোক না।

হইলেও কোনও অসুবিদা নাই বাজান। বড় বড় পুলিশ দুই চাইরজন আমগ গেরামেও আছে। সিআইডি আছেন কাশেম সাব, এসপি না কী জানি হইতাছে আমার আমিনল কাকা। আমার বাপের চাচতো ভাই।

আমি সত্যকথা বলছি, আমি পুলিশের লোক না।

তয় সাংবাদিক। সাংবাদিক হইলে তো আপনে আমার ফুবাতো ভাইরে চিনবেন। আমার বাপের বড় চাচার বড় মাইয়ার মাজারো পোলা। নাম হইল এমদাদুল হক মিলন। বই লেখে, টিবিতে নাটক লেখে।

নীলু বলল, এমদাদুল না, তাঁর নাম হলো ইমদাদুল। জ্বী তাঁকে আমি চিনি। কিন্তু আমি সাংবাদিক না।

সেন্টু মস্তান নড়েচড়ে বসল। তয় বাজান আপনে কী? আপনে কে?

নীলু আচমকা উঠে দাঁড়াল। এই রহস্য দুতিনদিন পর এসে আপনাকে আমি বলে যাব।

ওসমান গনী তালুকদারের বাড়ি দেখে জয়িতা একেবারে লাফিয়ে উঠল। ওয়াও! এ তো দেখছি ছপনপরি গো!

বাড়ি দেখে লালুবাবুও মুগ্ধ। একবার এদিক তাকাচ্ছেন, একবার ওদিক।

মাওয়া চৌরাস্তা থেকে পুবদিকে চলে যাওয়া রাস্তার পাশে বাড়ি। গাড়ি ঢুকে গেছে বাড়ির একেবারে উঠোনে। বাড়িতে ঢোকার মুখে টিন এবং কাঠের কারুকাজ করা দোতলা বাংলো। আর উঠোন তো উঠোন না, বিশাল মাঠ। কোথাও মাটি দেখা যায় না, কার্পেটের মতো বিছানো সবুজ ঘাস। পশ্চিমে একতলা লম্বা মতন একটা বিল্ডিং, পুবদিকে বাঁধানো ঘাটলার সুন্দর পুকুর। পুকুরের ওপার আর পুব দক্ষিণে বাগান। বাগান ভর্তি নানা রকমের গাছপালা। দক্ষিণে বাড়ি ছাড়িয়ে অনেকখানি দূরে নতুন একখানা মসজিদ। জানুয়ারি মাসের ফুরিয়ে আসা বিকেলে চমৎকার লাগছে পরিবেশটা।

কিন্তু লালুবাবু কোনও কথা বলছেন না। কী রকম যেন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছেন। গাড়ি থেকে নামার পরই, ওসমান গনী তালুকদারের বাড়ির মাটিতে পা দিয়েই গোপনে গোপনে গা কেমন কাঁটা দিচ্ছিল তাঁর। মনের ভেতরটা কী রকম উথাল পাথাল করছিল। এই গ্রামের নাম কুমারভোগ। উয়ারির পাশের গ্রাম। এই মাটি তাঁর আজন্ম চেনা। এই মাটির ওপর দিয়েই কি একজীবনে বহু বহুবার হেঁটে যাননি তিনি? এ তো তাঁরই মাটি, তাঁর নিজস্ব মাটি।

মাইক্রোবাসটা দাঁড়িয়ে আছে বাংলোর সামনে। গাড়ি থেকে টুকটাক জিনিসপত্র নামিয়ে দিচ্ছে খোকন। একজন কামলা মজুর ধরনের লোক আর একজন ঝি সেসব বয়ে নিচ্ছে লম্বা দালানে। বোঝা যায় বাড়ির লোকজন সব ওখানেই থাকে। কিচেন ডাইনিং থাকার ঘরটর দালানাটাতেই সব। ওদিকটায় মানুষজনও দেখা যাচ্ছে বেশ। বেশিরভাগই কাজের লোকজন। কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছে দালানের সামনের দিকটায়। নেটফেট কিচ্ছু নেই। র‍্যাকেট আর প্লাস্টিকের কর্ক নিয়ে পিটাপিটি করছে। সন্ধেবেলার হাওয়ায় পুকুরের ওপার থেকে ভেসে আসছে হাসনুহেনার গন্ধ।

হাতের কাজ শেষ করে খোকন এসে দাঁড়াল জয়িতা আর লালুবাবুর মাঝখানে। হই হই করা গলায় বলল, জাগাডা চিনছেন দাদা?

লালুবাবু স্মৃতিকাতর চোখে খোকনের দিকে তাকালেন। সেইভাবে চিনতে পারতাছি না। সবকিছু একদোম বদলাইয়া গেছে। এইডাই যে কুমারবুগ আমার মনেই হইতাছে না।

মনে হওনের কথা না দাদা। চল্লিশ পঞ্চাশ বচ্ছরে দেশ তো আর কম বদলান বদলায় নাই। সাধিনতার আগে দেখলে যাও চিনতে পারতেন এখন তাও পারবেন না। সাধিনতা তো এমতেই দেশ বদলাই দিছে। আর বিক্রমপুরডা, আমগ এই এলাকাডা বদলাইয়া দিছে ঢাকা খুলনা মহাসড়ক। যেই সড়ক দিয়া আমরা আইলাম।

লালুবাবু কথা বললেন না।

খোকন বলল, গনীদার বাড়ির লগের রাস্তাডা কই গেছে জানেন?

না। কই গেছে কও তো?

এইডা কইলাম আপনের কওন উচিত আছিল। কুমারবুগ থিকা পুবমিহি কোন কোন গেরাম আপনের মনে নাই?

আছে। উয়ারি, শিমইল্লা, কোরাসি, ঘোরদৌড়, ব্রাহ্মণগাঁও, দিঘলি।

এইত্তো কইতে পারছেন। এই রাস্তা গেছে লৌহজং। তয় গনীদার বাড়ি যেই জাগায়, যেহেনে আমরা খাড়ই রইছি, নাম কওনের লগে লগে জাগাডা আপনে চিন্না ফালাইবেন।

কও তো!

লালুবাবুর চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রহস্যময় গলায় খোকন বলল, এইডা হইল চন্দ্রেরবাড়ি। কুমারবুগ চন্দ্রেরবাড়ি।

চন্দ্রেরবাড়ি শুনে লালুবাবু যেন বিশাল একটা ধাক্কা খেলেন। প্রথমে একটু নড়েচড়ে উঠলেন তারপর শিশুর মতন একটা লাফ দিলেন। কও কী? আরে কও কী তুমি? এইডা চন্দ্রেরবাড়ি! এইডা কুমারবুগের সেই বিখ্যাত চন্দ্রেরবাড়ি? তয় সেই বটগাছটা কো? সেই বিরাট মাঠখান কো?

আছে, দুইখানই আছে।

আমারে দেখাও দাদা, অহনই আমারে দেখাও।

জয়িতা বলল, এখনই দেখার কী হলো? সাঝবেলাতে তোমার ওই বুড়ো চোখে কিছু দেখতে পাবে? তাছাড়া দেশগ্রাম এলাকায় ছাপখোপের ভয় রয়েচে না? কাল ছকালে দেখো।

শীতকালে সাপখোপের ভয় থাকে না রে পাগলী। শীতকালে সাপ থাকে গর্তে। ওটাকে বলে শীতনিদ্রা।

বুজলুম। কিন্তু এখন যাবার দরকার নেই। এখন একটু চা ফা খাবো, রেস্ট ফেস্ট নেবো। বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে গল্পগুজব করবো, এই তো!

খোকন বলল, দিদি মনে হয় টায়ার্ড হইয়া গেছে।

না, তা তেমন হইনি। তবে ছকাল থেকে বুড়োটা তো আর কম জ্বালায়নি! হেই হ্যাপা ছামলাতে ছামলাতে ক্লান্ত তো একটুখানি হয়েছিই।

লালুবাবু বললেন, তুই ক্লান্ত হইছস তুই রেস্ট ল। আমি তো তরে কই নাই আমার লগে যাইতে। চন্দ্রেরবাড়ির বটগাছ, মাঠ ওই হগল দেইখা তুই তো আর কিচ্ছু বুঝবি না। তুই থাক। আমি খোকনরে লইয়া জাগাডা একবার চক্কর দিয়াসি।

বললুম যে এখন হবে না।

তার উচ্ছ্বাস এভাবে থামিয়ে দেয়াটা ভাল লাগছিল না লালুবাবুর। তিনি গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলেন।

জয়িতা ব্যাপারটা বুঝল, বুঝে নরম হলো। ছোনো বুড়ো, তুমি আমাকে যাই মনো করো, অর্থাৎ যত ছোট মনে করো, আমি কিন্তু তা নই। বুঝি প্রায় ছবই। তোমার আবেগ উচ্ছ্বাস ভাললাগা ছব আমি হৃদয় দিয়েই বুঝচি, কিন্তু তোমার প্রতি আমার একটা দায়িত্ব রয়েছে। এদেশে আমি এয়েচিই তোমাকে আগলে রাখবার জন্য। মা আমাকে ছেজন্যই পাঠিয়েচে। এখন রাতবিরেতে বাড়ির বাইরে যাবার দরকার নেই। দিনেরবেলা যেওক্ষণ। কেউ তো তোমাকে আটকে রাখচে না। তুমি বুজদে পারচ না, বিদেশ বিভুঁই জায়গায় কত রকমের বিপদ আপদ হতে পারে।

লালুবাবু রেগে গেলেন। বিদেশ বিভুঁই অর্থ কী? এইটা বিদেশ হইব ক্যান? এইটা আমার দেশ। আমার মাটি। এই মাটিতে আমি জন্মাইছি, এই মাটিতে আমি বড় হইছি। মানুষ বদলায়, মাটি বদলায় না। মাটি আগেও যা আছিল এখনও তা আছে।

বুজলুম। এতো লেকচার ঝাড়বার কিছু নেই।

খোকন বলল, তয় দিদি, তোমার একখান কথার আমি প্রতিবাদ করতাছি।

জয়িতা হাসিমুখে খোকনের দিকে তাকাল। কোন কথা গো?

ওই যে কইলা বিদেশ বিভুঁই জাগা, কত রকমের বিপদ আপদ হইতে পারে।

ভুল বলেছি? হতে পারে না?

ভুল বলছো। হইতে পারে না। তোমরা আইছো কাজির পাগলা ইসকুলের প্রোগ্রামে, আমগ গেস্ট হইয়া আইছো। তোমগ প্রোটেকসনের দায়িত্ব আমগ। একলা একলা যুদি সারারাইতও তোমরা পুরা এলাকা ঘুইরা বেড়াও, বিপদ আপদ তো দূরের কথা, কেউ তোমগ মিহি চাইয়াও দেখবো না। বেবস্তা আমরা এমুনই করছি।

ছুনে খুছি হলুম।

জয়িতার কথায় যেটুকু রাগ ভেতরে ভেতরে হয়েছিলেন লালুবাবু কোন ফাঁকে যেন সেটুকু কেটেও গেছে। ব্যাপারটা বুঝে জয়িতার দিকে হাসিমুখে তাকালেন তিনি। সরল গলায় বললেন, এই ছেমড়ি, হোন, তরে একখান কথা কই।

কপট ভঙ্গিতে মুখিয়ে উঠল জয়িতা। এই বুড়া, খবরদার বলচি, আমাকে ছেমড়ি বলবে না।

তাইলে কী কমু? ছুকড়ি?

না তাও না।

তয় তগো ঘটিভাষায় কমু? ছোড়ি?

খোকন হো হো করে হেসে উঠল।

লালুবাবু বলল, যেইডা কইতে চাই হেইডা হোন। এখানে আসনের পর আমি যহন বটগাছটা দেখতে চাইলাম, মাঠখান দেখতে চাইলাম, তুই যহন আমারে যাইতে দিলি না, তর উপরে আমি বেদম চেইত্তা গেলাম। মনে হইল তরে একখান থাবড় মাইরা দেই। কতক্ষুণ পর দেখি সেই রাগটা আমার নাই। রাগটা জল হইয়া গেছে। এইটা ক্যান হইল জানচ? এইটা হইল মাটির গুণে। এতদিন পর আপনা মাটিতে আইয়া খাড়াইছি, মাটি আমারে এমুন মায়া করতে আরম্ব করছে, এত মায়ার মইধ্যে মানুষ রাগ করতে পারে না। পোলাপান যুদি চেইত্তা যায়, তহন যুদি মায় তারে বুকে প্যাচাই ধইরা আদর করে, তহন কি পোলাপানের আর রাগ থাকে, ক?

এসময় সাত আট বছরের মিষ্টি মতো একটা মেয়ে ছুটতে ছুটতে এলো জয়িতাদের কাছে। তার পেছন পেছন এলো ছোটখাট, ফর্সা, স্নিগ্ধ ধরনের একজন মহিলা।

মহিলাকে দেখে খোকন একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। লালুবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা, এই হইতাছে গনিদার বউ। আর এই কেতরাডা হইতাছে গনিদার মাইয়া। গনিদার এক পোলা এক মাইয়া। পোলার লগে মাইয়ার বয়েসের ফারাক অনেক। বারো তেরো বচ্ছর। পোলা পড়ে আমেরিকায়। এই তো কিছুদিন আগেও ভাবী গিয়া অনেকদিন পোলার কাছে থাইক্কা আইছে।

ওসমান গনি তালুকদারের স্ত্রীর নাম নাহিদ আকতার। কথায় কথায় সুন্দর করে হাসার অভ্যাস তাঁর। এখনও হাসলেন। হাসিমুখে সালাম দিলেন লালুবাবুকে।

লালুবাবু বিনীতভঙ্গিতে দুহাত বুকের কাছে তুললেন। নমস্কার।

ছোট্ট মেয়েটিকে কোন ফাঁকে পাঁজাকোলে নিয়েছে খোকন। এখন দুহাতে তাকে দোল দিচ্ছে। মেয়েটি খিলখিল করে হাসছে।

নাহিদকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল জয়িতা। হালকা আকাশি রংয়ের শাড়ি পরে আছেন তিনি। গলায় চেপ্টা ধরনের একটা চেন, দুহাতে দুটো করে বাওটি। নাকফুলটা থেকে থেকেই ঝিলিক দিচ্ছিল। তার মানে হিরার নাকফুল। ঢাকায় ওসমান গনি তালুকদারকে দেখে তেমন কিছু বোঝা যায়নি। গ্রামের বাড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি বিশাল বড়লোক। বিস্তর টাকা পয়সার মালিক।

নাহিদও তখন জয়িতার দিকে তাকিয়েছেন। তোমারে তুমি কইরাই বলি। তোমার কথা আমি শুনছি। দাদার নাতনি তুমি। তালুকদার সাবে মোবাইলে তোমার নামও বলছে, নামটা আমি ভুইলা গেছি।

জয়িতা মৃদু হেসে বলল, জয়িতা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, জয়িতা। তয় আসতে কোনও অসুবিধা হয় নাই তো?

না না। খুবই আরাম করে এলুম।

লালুবাবু বললেন, না না খুব আরাম কইরা আসি নাই বউঠান। ভাল একখান যন্ত্রণার মইধ্যে পড়ছিলাম।

নাহিদ চিন্তিত হলেন। খোকনের দিকে তাকালেন। কিয়ের যন্ত্রণা খোকন ভাই?

মেয়েটিকে কোল থেকে নামিয়ে দিল খোকন। আর কইয়েন না। একটা চিজের পাল্লায় পড়ছিলাম। ছেমড়াডার হেড অফিসে পুরা গণ্ডগোল।

কোন ছেমড়া?

পরে কমুনে। গনিদায় আসুক। গেস্ট আরও যারা আসতেছে আসুক। রাইতে তো বিরাট আসর হইবো, সেই আসরে কমুনে। আসর গরম করার মতন গল্প।

আইচ্ছা ঠিক আছে।

এই একটা কথায় লালুবাবু বুঝে গেলেন বেশিরভাগ মহিলার মতো অতি আগ্রহী মানুষ না নাহিদ। বেশ সংযত ধরনের মানুষ।

জয়িতার তখন চকিতে মনে পড়েছে নীলুর কথা। অদ্ভুত চরিত্র। সিনেমা নাটকে এই ধরনের চরিত্র দেখা যায়। চেহারা সুরত আচার আচরণ কথাবার্তা সব মিলিয়ে খুব এট্রাকটিভও। রহস্যময়, ঠাট্টাপ্রিয় তারপর আশ্চর্য এক সরলতাও আছে। মেয়েরা এই ধরনের পুরুষ পছন্দ করে।

নাহিদ বললেন, দাদা, আসেন আপনের রুম দেখাইয়া দেই।

লালুবাবু ব্যস্ত হলেন, চলেন বউঠান, চলেন।

এবার নাহিদ যেন একটু লজ্জা পেলেন। আমারে আপনে আপনে কইরা বইলেন না দাদা। আমার জানি কেমুন লাগে। আমারে তুমি কইরা বলেন।

আইচ্ছা-আইচ্ছা। ঠিক আছে। তুমি কইরা বলুম ঠিকঐ তয় বউঠানটাও বলুম। তোমারে বউঠান বলতে আমার ভাল লাগতাছে।

আইচ্ছা ঠিক আছে, সেইটা বইলেন।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা কাঠের কারুকাজ করা সেই বাংলোটায় এসে ঢুকলেন।

খোকন বলল, দিদি, এই ঘরটায় কত খরচ হইছে জানো?

জয়িতা খোকনের দিকে তাকাল। কতো গো?

অনুমান করো তো?

আমার অনুমান ছক্তি নেই।

তাও একটা কিছু কও। যা মনে আসে কও।

দছলাখ।

না।

তাহলে?

তুমি যেইটা কইলা ওইটার থিকা সাড়ে ছয়গুণ বেশি।

কী?

হ। পাষাট্টি লাক টেকা খরচা হইছে এই ঘরটায়।

শুনে জয়িতা একেবারে হতভম্ব। মুখে কথা আটকে গেল তার। লালুবাবু কোনও রকমে বললেন, পয়ষট্টি লাখ? কও কী?

জ্বি।

জয়িতা বলল, তবে তো আমাকে এই ঘরেই থাকতে হবে। কালনায় গিয়ে বলব, যে ঘরে ছিলুম সেই ঘরের দাম পয়ছট্টি লাখ রুপি।

লালুবাবু বললেন, নারে রুপি না। টাকা, টাকা। বিডিটি। বাংলাদেশি টাকা।

ওই হলো!

নাহিদ বললেন, ঠিক আছে তোমার থাকার ব্যবস্থাও এই ঘরেই করছি।

খোকন বলল, তার আগে ইকটু চা বিস্কুট দেন না ভাবী। খিদা লাইগা গেছে।

দিতাছি। জয়িতা, তোমরা হাতমুখ ধুইয়া ফ্রেস হও।

তার আগে আমার রুমটা দেখিয়ে দিন।

দেখানের কিছু নাই। তোমার যেই রুম পছন্দ সেই রুমেই থাকতে পারো।

খোকন বলল, দিদি, তার আগে তুমি দোতলাটা দেইখা আসো। দোতালা দেখলে নিচে তুমি আর নামতেই চাইবা না। ওহেনেই থাকতে চাইবা।

তাহলে যাই।

নাহিদ বলল, সবাই মিল্লাই যাই।

লালুবাবু বললেন, হ চলো।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠলো ওরা। দোতলা দেখে জয়িতার মাথা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। চারদিকে চওড়া সুন্দর বারান্দা। ভেতরে মাঝখানের বড় রুমটা বসার আর সেই রুমের দুপাশে দুটো করে বেডরুম। পুবদিককার একটি রুম নিয়ে নিল জয়িতা। লালুবাবুকে বলল, বুড়ো, তুমি আমার পাশের রুমটা নাও।

নাহিদ বললেন, দাদায় নিচেই থাকুক। পুরুষ মানুষরা সব নিচেই থাকবো। মহিলা যারা যারা আসতাছে তারা উপরে থাকবোনে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোনও অসুবিধা নেই।

ততোক্ষণে সারা বাড়ি আলোকিত হয়ে গেছে। কে কোন ফাঁকে জ্বালিয়ে দিয়েছে আলো ওরা কেউ খেয়াল করেনি।

কিন্তু লালুবাবু আবার অন্যমনস্ক হয়েছেন। তাঁর স্মৃতিতেও যেন জ্বলে উঠেছে অজস্র আলো। সেই আলোয় তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন বহু বহুবছর পিছনে ফেলে আসা একটি জীবন। উয়ারি গ্রাম, কাজির পাগলা হাই স্কুল, বাড়ি থেকে মাইল আধমাইল দূরে পদ্মা। কী বিশাল সেই নদী, এপার ওপার দেখা যায় না। ভোররাতে ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জ চাঁদপুর হয়ে গোয়ালন্দ যায় স্টিমার। লৌহজংয়ে থামে, ভাগ্যকূলে থামে। ঠিক উয়ারির কাছাকাছি এসে দুবার ভোঁ দিতো স্টিমার। ছেলেবেলা থেকেই সেই শব্দে ঘুম ভাঙতো লালুবাবুর। মনটা উদাস হয়ে যেতো। ইচ্ছে হতো একদিন এই স্টিমারে চড়ে গোয়ালন্দ হয়ে কলকাতা যাবেন। ঘুরে ঘুরে দেখে আসবেন সেই স্বপ্নের শহর। হাওড়া ব্রিজ, গড়ের মাঠ। কে জানতো, চিরতরেই একদিন দেশ ছেড়ে সেই দেশে চলে যেতে হবে। আপনদেশ পর হয়ে যাবে। সেই দেশে ফেরার আর পথ থাকবে না।

লালুবাবুর বুকটা হু হু করতে লাগল। চোখ ভরে এলো অশ্রুতে। কেউ তা দেখতে পেল না।